দিবাকরী

দিবাকর শর্ম্মা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ

৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নূতন
সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়, ১৩৬১

একটাকা
বার আনা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র বন্ধুগণকে
উপহৃত হইল

লিপি বিবৰ্ত্তনী—

বাল্যাবধি গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত প্রবল। প্রবৃত্তিটা অনেকদিন চাপা পড়িয়া ছিল, শেষে গবেষকদিগের সম্মান দেখিয়া গত বৎসর গবেষক হইবার ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু গবেষণার নূতন কোনও ক্ষেত্র দেখিলাম না। ভাষাতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আরসোলার বংশানুক্রম পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্ষেত্রই মহারথী এবং রথীরা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। শেষে দৃষ্টি পড়িল একখানি চিঠির দিকে। মাথায় বুদ্ধি আসিল। সেইদিন হইতে বাঙ্গলার লিপিসাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করিলাম। সম্প্রতি আমার দফ্তরে অনেকগুলি পত্র জমিয়াছে—ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি। নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি প্রেমপত্র—আমি তাহার যুগবিভাগ করিয়া দিলাম।

(আদিম বর্ব্বর যুগের লিপির প্রতিলিপি।

তুলোট কাগজ—কষকালী)

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

১৯ চৈত্র

শকাব্দ ১৬৭০।

পরম শুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু বিশেষ :—

প্রিয়ে কাদম্বরি !

অদ্য অমাবস্যা তিথি, অস্মদগণের অনধ্যায় বিধায় তোমার জন্য এই পত্র রচনা করিতেছি। অপরাহ্নে পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহাশয় ফলাহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছেন, মদীয় সতীর্থেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। আমি শিরঃপীড়ার হেতু দর্শাইয়া একক চতুষ্পাঠী গৃহে অবস্থান করিতেছি। অহো দুর্ভাগ্য ! পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নিকটও তোমার জন্য অনৃতভাষী হইতে হইল !

আমার শিরঃপীড়া হয় নাই, প্রিয়ে চিন্তিতা হইবা না। কেবলমাত্র নির্ব্বিঘ্নে পত্র লিখন ব্যাপার সমাধা করিতে পারিব বলিয়াই উক্তরূপ ছলনা করিয়াছি। প্রণয় ব্যাপারে মিথ্যাচরণে পাপ নাই, এবম্প্রকার নীতিবাক্য আছে—এই নীতির অনুসরণ করিয়াছি।

প্রিয়ে! তোমার প্রণয়বারি সেচনে আমার প্রেমতরু ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; শীঘ্রই উহা বিরাট মহীরুহে পরিণত হইবেক এইরূপ আশা করা যাইতেছে, তখন কি প্রকারে গুরুগৃহে অবস্থান করিব তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এক্ষণে গৃহে গমন করিলে পিতামাতা অসন্তুষ্ট হইবেন। পূজনীয় অধ্যাপক মহাশয়ও বিরূপ হইতে পারেন, কারণ অনুমান খণ্ডের বৃত্তি এ পর্য্যন্ত সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া উঠিতে সমর্থ হই নাই— এ কারণ ইতিপূর্ব্বেই তিনি আমাকে চতুষ্পদ প্রাণী বিশেষের সহিত উপমিত করিয়াছেন, সে প্রাণীর নাম উল্লেখ করিয়া তোমাকে আর পতিনিন্দা শ্রবণের অপরাধে অপরাধিনী করিতে বাসনা করিতেছি না।

তুমি সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মদীয় অনুমতি প্রার্থিণী হইয়াছ। সাবিত্রীব্রত চতুর্দ্দশবৎসরান্তে উদ্‌যাপন করিতে হয়। অচিরাৎ উদ্‌যাপন করিতে হয় এমন ব্রত সম্প্রতি গ্রহণ করিতে যত্নবতী হইলে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইব, কারণ ব্রতোদ্‌যাপন ব্যপদেশে গৃহে গমন করতঃ তোমার বদন সুধাকর দর্শন করিয়া আমার নয়ন চকোরকে চরিতার্থ করিতে পারি। গৃহে গমন করিবার এই একমাত্র উপায় আছে। বিরহ যন্ত্রণায় আমি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। গতকল্য নলিনীপত্রের দ্বারা শয্যা রচনা করিব সঙ্কল্প করিয়া সরোবরে

অবতরণ করিয়াছিলাম তৎকালে একটি কর্কটিকা আততায়ী ভ্রমে বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দংশন করে—সম্প্রতি বিরহ যন্ত্রণা অপেক্ষা দষ্ট স্থানের যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ অধিক অনুমিত হইতেছে। শ্রীযুক্তা গুরুমাতা ঠাকুরাণী একটি প্রলেপ দিয়াছেন, তৎপ্রয়োগে আরোগ্য হইবেক এইরূপ মনে করিতেছি। তুমি এ সংবাদে দুঃখিতা হইবা না, শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিব।

গুরুজনের সেবায় সর্ব্বথা অবহিতা থাকিবা। অলমতি বিস্তরেণ।

আশীর্ব্বাদকস্য
শ্রীদামোদর শর্ম্মণঃ।

২নং পত্র

[সম্ভবতঃ উক্ত পত্রের উত্তর]

(তুলোট কাগজ—কষকালী)

নমঃ শিবায়।

৪ বৈশাখ।

শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন—

স্বামিন্—আপনার আশীর্ব্বাদ সম্বলিতা পত্রিকা যথাকালে হস্তগত হইয়াছে। শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠ বাবাজীবনের পুত্রসন্তান

জন্মলাভ করায় জননাশৌচ হইয়াছিল তৎকারণ মসীপত্রাদি স্পর্শ করিতে পারি নাই।

মদ্ধেতু আপনকার বিরহ যন্ত্রণা তল্লাঘবার্থে নলিনীপত্র আহরণ কালে কর্কট কর্তৃক দষ্ট হইয়াছেন জানিয়া সবিশেষ মনস্তাপ হইল। স্বামীর যন্ত্রণার কারণ হইলাম। আমাপেক্ষা পাপীয়সী আর কেহ নাই। কিরূপে এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব তাহাই চিন্তা করিতেছি। অত্য ব্যবস্থা—কল্পক্রমঃ ও প্রায়শ্চিত্ত—তত্ত্বকৌমুদী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উক্ত পাপ-ক্ষালনের কোনরূপ নির্দ্দেশ পাইলাম না, কারণে মন অধিকতর চঞ্চল হইয়াছে। আপনি বিজ্ঞজন—পত্রের উত্তরে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রেরণ করিয়া চরণাশ্রিতাকে পাপমুক্তা করিবেন।

ব্রত সম্বন্ধে আপনা কর্তৃক যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অতীব সমীচীন। কিন্তু অপর উদ্দেশ্য লইয়া ব্রত গ্রহণ করিলে পুণ্যের অপলাপ ঘটিবে—অপিচ পূজনীয়গণকে কিরূপে প্রতারণা করিব ? তাঁহাদিগের নিকট উদ্দেশ্য গোপন করিলে পরকালে অনন্ত নিরয়ভাগিনী হইবার আশঙ্কা জন্মিতেছে।

কল্য মধ্যাহ্নে যখন আপনাকে উদ্দেশে অন্ন নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছিলাম, তৎকালে গৃহে ভাগ্যক্রমে অতিথি সমাগত হইল। অতিথি সৎকার করিয়া সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া শ্রীভগবানের চরণে ভবদ্দর্শন প্রার্থনা

করিলাম; বহুকাল পর অতিথি সেবার সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে মনে হইল শুভদিন সমাগত হইয়াছে। শীঘ্রই মদীয় বিরহকালের অবসান হইবে। আশা করা যায় যে, অচিরাৎ আপনার শ্রীচরণ দর্শনে অধিকারিণী হইব।

আমার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। দিবাভাগে গুরুজনের সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কষ্টের কথা স্মরণ হয় না। রাত্রিকালে বিরহ যন্ত্রণা দুঃসহ হইলে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকি—নচেৎ সাবিত্র্যুপাখ্যান পাঠ করি।

আপনি বিজ্ঞজন, সামান্য নারীর জন্য অধীর হইবেন না। বিরহ যন্ত্রণা সমধিক হইলে বিবেক চূড়ামণি পাঠ করিবেন কদাপি নলিনীপত্র চয়নে প্রবৃত্ত হইবেন না।

কল্য এক শিষ্য পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীকে বার্ষিক প্রণামী স্বরূপ একটি হরিতকী সহ একখানি লালশাটী প্রেরণ করিয়াছে। মাতাঠাকুরাণী উহা দ্বারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আপনি গৃহে আগমন করিলে আমি উহা পরিধান করিয়া একাধিক সহস্র বিল্বদলে মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিব এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি।

সেবিকার অনন্ত কোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। অলমিতি।

ভবচ্চরণ সেবিকায়াঃ

শ্রীমত্যা কাদম্বরী দেব্যাঃ

৩নং পত্র

(মধ্য-রোমান্টিক যুগ। পাতলা চিঠির কাগজ। উপরে একটি পাখীর ছবি, তাহার ঠোঁটে একখানি খাম, নীচে ছাপা—"যাও পাখী বল তারে, সে যেন ভোলেনা মোরে।")

কলিকাতা

তাং ২৫ চৈত্র, সন ১২৯৭।

প্রাণাধিকে হৃদয়েশ্বরি হেমাঙ্গিনী,

আপিস হইতে আসিয়া তোমার সুধামাখা প্রেমলিপি পাইলাম। পড়িয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইল। আমি পক্ষী হইলে উড়িয়া তোমার নিকট যাইতাম, মেঘ হইলে ভাসিয়া গিয়া তোমার চন্দ্রমুখ দেখিয়া আসিতাম, মলয় বাতাস হইলে তোমার কেশরাশি দোলাইয়া আসিতাম। কেন ভগবান আমাকে পক্ষী, মেঘ কিংবা মলয় বাতাস না করিয়া রেল আপিসের কেরাণী করিলেন ?

তুমি লিখিয়াছ তোমার পত্র পাইলে আমার আনন্দ হয় না। আনন্দ হয় কিনা কেমন করিয়া জানাইব প্রাণেশ্বরি ? আমাদের হোটেলের ঝি ক্ষেন্তিকে জিজ্ঞাসা করিও,—আনন্দে আত্মহারা হইয়া আজ তাহাকে দোক্তা কিনিবার জন্য তিন পয়সা বক্‌সিস দিয়াছি কিনা। গোবিন পিওনকে জিজ্ঞাসা করিও

গত রবিবারে তোমার চিঠি আসিলে এক বাণ্ডিল নূতন মৌড়ী বিড়ি তাহাকে দিয়াছি কি না? বেণুধর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও যেদিন তোমার চিঠি আসে সেদিন আমি রাত্রে ভাত না খাইয়া রাবড়ী ও লুচী খাই কি না? তাহারাই আমার প্রাণের আনন্দের সাক্ষী দিবে—আমি নিজ মুখে আর কি বলিব?

প্রিয়ে, তুমি লিখিয়াছ যে ওপাড়ার সইদিদি বলিয়াছেন যে; বাঁশপাতা প্যাটার্ণের চুড়ী তোমার হাতে বেশ মানায়। তাহাই হইবে, কালই আমি তোমার জন্য বাঁশপাতার সন্ধান করিব। ডবল বিস্কুট নেকলেস গড়াইবার সময় আমানৎ খাঁ কাবুলীর নিকট হইতে কিছু টাকা দুই আনা সুদে ধার করিয়াছিলাম, উহা প্রায় শোধ হইয়া আসিয়াছে, কাজেই আশা আছে বাঁশ-পাতা চুড়ী পূজার সময় নিজ হস্তে তোমার কোমল করে পরাইতে পারিব।

একবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস প্রেমকুরঙ্গিনি! শৈবলিনী যেমন প্রতাপকে, দরিয়া যেমন মোবারককে, আয়েষা যেমন জগৎসিংহকে, কুন্দনন্দিনী যেমন নগেন্দ্রকে, রোহিণী যেমন গোবিন্দলালকে—ততখানি, না তদপেক্ষা অধিক? আমার মনে হয় অধিক প্রিয়ে, কারণ ইহারা সকলেই রাত্রিতে ঘুমাইতেন, কিন্তু তুমি লিখিয়াছ যে তুমি রাত্রিতে নিদ্রা যাও না, ক্রমেই শীর্ণ হইয়া পড়িতেছ; অথচ

অনন্ত তোমার হাতে আঁট হইতেছে। শরীর শীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বাহু মোটা হওয়া নিশ্চয়ই কোনও রোগের লক্ষণ, আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছি প্রাণকান্তে, কাল প্রভাতেই নকুড় ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিব।

প্রিয়ে, তবে এইবার বিদায় লই। তোমার জন্য বাবুধাক্কা পাড় শাড়ী ১ জোড়া, সতী শাঁখা ১ জোড়া, বিনোদবেণী সুবাসিত কেশতৈল ১ বোতল, ফুলশয্যা তরল আলতা ১ বোতল কিনিয়া রাখিয়াছি। মনভুলানো টিপ, মানময়ী আয়না, সাবিত্রী চিরুনী, কদম্বকেলি তাস, মহারাণী এসেন্স, 'অভিনব প্রেমপত্র' এখনও খরিদ করা হয় নাই, শীঘ্র করিব। সচিত্র গোলোকধাম খেলা ও রবি বর্ম্মার ছবির কথা ভুলি নাই; প্রজাপতি কাঁটা যদি পাওয়া যায় তাহাও সন্ধান করিব। পাউডার ও ঠোঁটের রঙ্গের কথাও মনে আছে। আর যদি কিছু লইবার থাকে তবে আমাকে জানাইবে, প্রিয়ে আমার নিকটে লজ্জা করিও না। আমি তবে বিদায় লই প্রিয়তমে।

আমার সহস্র কোটি চুম্বন গ্রহণ করিবে হেমাঙ্গিনী।

তোমারই প্রেমদাস

মুকুন্দ।

৪নং পত্র

(উক্ত পত্রের উত্তর। পাতলা চিঠির কাগজ। উপরে একটি লাল ফুলের কুঁড়ি, তাহার নীচে ছাপা—"শিশিরে কি ফুটে ফুল বিনা বরিষণে, চিঠিতে কি ভিজে মন বিনা দরশনে ?")

বাশখালি।
৮ বৈশাখ, ১২৯৮।

প্রাণেশ্বর হৃদয় সর্ব্বস্ব !

বিরহিণী চাতকিনীর মত আমি আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলাম, এমন সময় তোমার লিপিরূপ বারি পাইয়া শীতল হইলাম। প্রিয়তম তোমার বিরহে যে কেমন করিয়া আমি জীবন ধারণ করিতেছি, তাহা অন্তর্য্যামী জানেন—অন্য কেহ তাহা জানে না। রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি না, যতক্ষণ নিদ্রা যাই ততক্ষণ কেবল তোমার মধুর বদনখানিই স্বপ্নে দেখি। দিবসে আহারাদি করিয়া যখন তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে বসি, তখন তোমার কথা স্মরণ হয়—তুমি থাকিলে নিজহাতে পান সাজিয়া আমার বদনে প্রবেশ করাইয়া দিতে। প্রাণনাথ সে সব কথা কি ভুলিতে পারি ? তোমার হাতের কোঁচান শান্তিপুরে শাড়ীখানি এখনও আলনায় তোলা আছে। তুমি যাইবার পর মাত্র পাঁচদিন ঐ শাড়ী পরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।

কি করিব ঐ একখানি ভিন্ন আমার আর ভাল শাড়ী নাই। তাই তোমার হাতের কোঁচান শাড়ী পরিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আমি নিমন্ত্রণ খাইতে যাই। সে দিন দত্ত বাড়ীতে আমার ডুমুর ফুলের হাতে একজোড়া ব্রেস্‌লেট্ দেখিলাম, কি চমৎকার। কলিকাতায় নাকি এই নূতন প্যাটেন উঠিয়াছে। প্রাণকান্ত তুমি এক বার সন্ধান করিয়া দেখিবে।

হৃদয়র্ষভ! কেমন করিয়া বলিব তোমায় কত ভালবাসি। আমি তোমাকে যত ভালবাসি, এত ভাল বোধ করি কোন্ স্ত্রী কোন স্বামীকে বাসে নাই। সখা তুমি আমার মন, তুমি আমার ধন, তুমিই আমার ব্রত পার্ব্বণ। যদি পাখী হইতাম, তবে উড়িয়া গিয়া তোমার ঠোঁটে ঠোঁট লাগাইয়া দাঁড়ে বসিয়া থাকিতাম। আর জন্মে যেন আমরা পাখী হইয়া জন্মগ্রহণ করি।

আমার শতকোটি চুম্বন জানিবে।

ইতি—

তোমারই হেমাঙ্গিনী।

৫নং পত্র

(বর্ত্তমান বস্তুযুগ। সবুজ চিঠির কাগজ। লাল কালী।)

"সাকী!

আজকে তোমার লিপি পেলুম। লিপিতো এ নয় এক পাত্র সুরা। পানে মাতাল হলুম, মত্ত মাতাল। আজ তৃষিত আমি, সাহারার মত দগ্ধকণ্ঠ। ধরণীর সমস্ত সুধা নিঃশেষে শুষে নিতে চাই আজ। ফোটার আনন্দে কুন্দবালা আজ দুলে দুলে হাসে—তায় দোলনের সুরা, সজনের ডালে ডালে গাওয়ার পুলকে ফিঙে নাচে তার নৃত্য-সুধা—সব পান কর্ত্তে চাই আমি, আজকের মত তৃষা এমন করে আর প্রাণকে আমার দগ্ধায়নি কোনো দিন।

পুরোণো দিনের জ্বালা আমাকে দগ্ধাচ্ছে। সেই পুরোণো দিন—যে দিন তুমি শুধু প্রেয়সী ছিলে, স্ত্রীরূপে ঘরে আসনি। শত ব্যবধানের অন্তরালে দুর্ল্লভ যখন ছিলে—তখনকার কথা। যখন তোমার জুতোর সুকতলাটি পর্য্যস্ত পথ থেকে আমি চোরের মত কুড়িয়ে নিয়ে সযত্নে আমার কবিতার খাতায় পেজমার্ক করে রেখেছি। সে কী আনন্দ! কী পুলক! কেন তুমি চিরকাল প্রেয়সীই হইলে না—চিক পর্দ্দার আড়ালে চিরন্তন রহস্তের মদির মাধুরীর মত লুপ্ত হ'য়ে—আমার নিশীথ রাতের সুখ-কল্পনার মতো? সে কী উৎকণ্ঠার উল্লাস! পাশের বাড়ীর

বারান্দায় টিক্‌টিকির শব্দে যখন চকিত হ'য়ে উঠতুম। তোমার বাড়ীর ছাদ থেকে সুরু করে নীচের ফুটপাথের সঙ্গে পর্য্যন্ত প্রাণের সখ্য ছিল, যেদিন তোমাদের বাড়ীর ডালের যোগানদার বিশাই পাঁড়ের মুখের বসন্তর দাগগুলো পর্য্যন্ত ভালো লাগত আমার! একদিনের কথা মনে পড়ে—যেদিন তোমার জিমি কুকুরের লেজ ছুঁতে গিয়ে আমি ফুটপাথে পড়ে আঘাত পাই—সে আঘাতের আনন্দ আমি আজো ভুলিনি।

কিন্তু সে আনন্দ কোথা আজ? স্বীকার কর্ত্তে দ্বিধা নেই—আজ তোমার লিপিতে উথলে ওঠে শুধু জ্বালার তুফান—স্মৃতির জ্বালা। তোমার পিয়ালা তো নিঃশেষে পান করেছি সাকী—তাই আজ নতুনরূপে পেতে চাই তোমাকে জগতের নামিকা অনামিকা—দেখা অদেখা সকল নারীর রূপে!…

৬নং পত্র

(চৌকো চিঠির কাগজ, নীল রং। কালী বেগুনি। মোটা নিবের গোটা হরফ।)

তারিখ জানি নাকো।
বেস্পতিবার।

আমার গুল বাগানের বুলবুল,

পেলুম লিপি। আশ্চর্য্য হলুম তোমার বড়াই দেখে। আমার পিয়ালা নিঃশেষে নাকি তুমি পান করেছ! সত্যি তো?

আমাকে পাওয়া তোমার শেষ হোয়েছে—মিছে কথা। তুমি পাগল—নারীকে কেউ নিঃশেষে পান কর্ত্তে পারে না। তার গোপন অন্তরের রহস্য লোকে মানুষের ঢোকবার ক্ষমতা নেই—স্বামী হোয়ে যে আসে তারও না। স্বামীর স্বামিত্ব তো শুধু দেহটার উপরে, তাই না? নারীর মনের স্বামী কে—তা সে নিজেই জানে না। তুমি তার জানবে কি? আষাঢ়ের পূরবিয়া আর ফাগুনের দখিণায় তার মনের বীণায় যে গোপন সুর বাজে তা যদি সবখানি শোনবার কাণ তোমার থাকৃত, তবে সত্যি পাগল হোয়ে যেতে তুমি। তুমি স্বামী, সব কাজেই তোমাকে দরকার; স্পষ্ট কথা শুনিয়ে তোমার মাথা খারাপ করে দিলে ক্ষতি সে তো আমারি—তাই সামলে গেলুম।

একটা কথা শুধু। ছোট্ট কথা একটুখানি। তোমার চোখে পুরোণো ঠেক্‌ছে আমাকে। কিন্তু জেনো বন্ধু আমি আজো নতুন তোমার কাছে না হোতে পারি, আমার নিজের কাছে আমি নতুন। আমার প্রাণের নদীর বুকে বালুচর জাগেনি আজো, এককুড়িদশে গালের গোলাপী ফিকে হোয়ে যেতে পারে—মনের রং পান্‌সে হোয়ে যায় না কোনোদিনো। ঝুনো খেজুর গাছ যে রস যোগায় তা মিঠে; কেউ জ্বালিয়ে নেয় গুড়, কেউ পচিয়ে করে তাড়ি। তুমি তাড়ি কোরেছ—সেই তাড়ি পান কোরে জ্বল্‌ছ তুমি! আর কিছু না!

একটা কথা সত্যি লিখেছ—যখন প্রেয়সী ছিলুম তখন ভালো লাগ্‌ত—বড় সত্যি কথা। আমারো বড় ভালো লাগ্‌ত সে দিনের সেই তোমাকে। আজ তোমাকে কাছে পেয়ে বুঝতে পারিনে ঠিক ভালো আজো লাগে কি না। মাঝে মাঝে সেই পুরোণো দিন—সেই হারানো দিনের মাঝে ফিরে যেতে সাধ হয়। কিন্তু পারিনে—পটুলি, গণেশ, খেঁদি আর ছোট খোকা পথ আগ্‌লে বোসে আছে। মনে মনে তাই আমাদের বিয়ের আগের লুকোচুরির রাজ্য গোড়ে তুলে সেখানে তোমাকে নেমন্তন্ন কর্‌ছি। এসো বন্ধু—ইতি—

কুহেলিকা

পুঃ—ফ্লবেয়ারের বইয়ের তর্জ্জমা বেরোনোর কথা ছিল যে, বেরোয়নি কি? বেরোলে পাঠিয়ে দিও।

৭নং পত্র

[অনাগত ভ্রূণযুগ]

(সবুজ কাগজে লাল হরপে টাইপ করা চিঠি।)

সোমবার ১২-৪৫ মিনিট, দুপুর।

কি ব'লে ডাক্‌ব তোমায়, কি ব'লে ডাক্‌লে খুসী হবে আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনে ব'লে এম্‌নি ধারা পাঠ ছাড়া—ন্যাংটো চিঠিটা তোমাকে লিখ্‌ছি। পার্চ্ছিনে না লিখে। তোমার সঙ্গে ঘন্টা

তিনেকের পরিচয় বটে কিন্তু তিন ঘণ্টা আমার কাছে তিন জন্ম ব'লে মনে হচ্ছে—যদিও জন্মান্তর আছে ব'লে বিশ্বাস নেই আমার।

আজ ব্রেকফাস্টের সময় কাট্‌লেটে কামড় দিতে কান্না পেল আমার। কাল সেই সিনেমা হাউসে ইণ্টারভ্যালের সময় একখানা কাট্‌লেট হু'জনে ভাগাভাগি ক'রে খেয়েছি—আর আজ তুমি কোথায়? কোথায় ১২নং গোরস্থান এভিনিউ আর কোথায় বা ২৭নং কেলিকদম্ব রোড্? তবে কাট্‌লেট খেয়ে যে রুমালটাতে হাত মুছেছিলে তুমি, সেটা আমি রেখেছি—কাল রাত থেকে সেইটি আমার সঙ্গের সাথী—চোখের জল, গায়ের ঘাম সেইটে দিয়েই মুছ্‌ছি আমি। আর তাতে ক'রেই স্পর্শ পাচ্ছি তোমার।

তোমাকে চাই আমি। পাব না কি?

চকোর চাকলাদার।
১২নং গোরস্থান এভিনিউ।

৮নং পত্র

(চিঠির কাগজ উক্ত প্রকার)

সোমবার,

রাত দুকুর।

আমার প্রাণ-হোটেলের নতুন বোর্ডার,

তোমার চিঠি। কাল তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। অবশ্য বরাবর যদি এমন ভালো লাগে তবে তো ভালো কথা। কিন্তু যদি না লাগে? কাজেই আমি একটা Trial দিতে চাইছি তোমাকে। আমি সাতদিনের কণ্ট্রাক্টে তোমাকে নিতে রাজী আছি। অবিশ্যি তুমি আমার বাড়ীতে আস্‌বে। তোমার আপিস তুলে আন্‌বে আমার বাবুর্চ্চিখানার পাশের ঘরটায়। তোমার কুকুর আন্‌তে পারবে না—কেন না তা হ'লে আমার কাব্‌লি বেরালটা ভয় পাবে। মিঃ বৈরাগী—যিনি আমার স্বামীর postএ গত তিন মাস ধ'রে কাজ কর্চ্চেন—তাঁর সঙ্গে আমার তিন মাসের agreement ছিল, কাল্ শেষ হবে, কাজেই কাল সন্ধ্যাবেলাতে তুমি আস্‌তে পার। মিঃ পিপাসু পাল—আমার সেক্রেটারীর ছেলে—সে দিন পৌরোহিত্যে First class honours নিয়ে পাশ করেছেন, তিনি পুরোহিত হবেন। রাত আটটার মধ্যে বিয়ে শেষ হয়ে যাবে। বাসর প্লামকেক

অথবা জিঞ্জার বিয়ার যে কোনও হোটেলে হ'তে পারে—তোমার খুসী।

তোমাকে ভালো লেগেছে ব'লেই বল্‌ছি—তিনটে জিনিষ আমি পছন্দ করিনে—

(১) সকালে ঘুম থেকে ওঠা, (২) চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়া, (৩) খেতে বসে পা দোলানো।

এ সব সর্ত্তে রাজী যদি তুমি থাক তবে কাল সকালে চিঠি দেবে। ঠিক্‌ বেলা ১০টায় যেন চিঠি পাই। কেন না আমার ছেলে দুটি Boarding Schoolএ আছে Ceremonyর সময় তাদিকে আন্‌তে হবে।

তোমার—

হ্রেষা হোড়।

২৭নং কেলিকদম্ব রোড।

---

* এ চিঠি দুইখানি আমার সংগ্রহের মধ্যে নাই। লিপি সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি শুনিয়া 'বাস্তবিকা'র সদস্তারা আগামী যুগের প্রেম পত্রের একটা আনুমানিক নমুনা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাই নকল করিয়া দিলাম।

দিবাস্বপ্ন

(রহিমী আমল)

সেদিন তুপুরবেলা Anglo Islamia Govt. Gazette খানা হাতে করিয়া গোলদীঘিতে ঢুকিলাম। মৎলব ছিল ঘুমাইবার, কারণ গত রাত্রে পাড়ায় ছিল স্পেন বিজয়ের উৎসব ; মুটু সেখ, জমির খলিফা প্রভৃতি সেকালের বিজয়ী মুরদের বাঙ্গালী বংশধরেরা ঢাল তলোয়ার লাঠি কাটারী ঢোলক কেনেস্তারা প্রভৃতি অস্ত্র এবং বাছযন্ত্র সহকারে আমার বাড়ীর দরজার সামনেই উৎসব-তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারি নাই। গোলদীঘির বেঞ্চের উপর গত রাত্রির নিদ্রার ক্রটিটুকু সংশোধন করিবার ইচ্ছা ছিল, গেজেটখানা মাথার নীচে গুঁজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ 'আল্লাহো আক্‌বার' শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষু মেলিয়া দেখি আমারই কাষ্ঠ-শয্যার হাত ছুয়েকের মধ্যে জন ত্রিশেক মুসলমান সমস্বরে আজান দিয়া নমাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু মুখে কিছু বলিবার উপায় নাই কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তির কপালে পেরেক ঠুকিয়া আমীর উল ওমরাহ উজীর রহিম ছাহেবের

হুকুমের একখানা 'এশ্‌তেহার' টাঙ্গানো আছে নজরে পড়িয়া গেল। তাহাতে লিখা আছে যে নমাজের সময় যদি কোনও কাফের কথা বলে কিম্বা কাশে অথবা মুখ-চোখের ইসারায় কোনও রকম গোস্‌সা প্রকাশ করে তবে তাহাকে এক চাঁদ ধরিয়া ঠাণ্ডি গারদে থাকিতে হইবে। ভয়ানক হুকুম! আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করিয়া পিছন ফিরিয়া একেবারে পূর্ব্বমুখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসের দিকে চলিলাম।

আপিসের তেতালার ঘরে ঢুকিতেই ডান হাত কপালে ঠুকিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিয়া উঠেন "আদাব ভাই ছাহেব!" আমি চমকিয়া উঠিলাম! ভুল করিয়া 'ছোলতান' আপিসে আসিয়া পড়ি নাই তো! ভাল করিয়া চাহিয়া চেখিলাম—না—সেই সব। শুধু টেবিল চেয়ার গুলির পরিবর্ত্তে সমস্ত মেঝে জুড়িয়া প্রকাণ্ড একখানা পারসী গালিচা পাতা, তাহার উপরে দুই হাঁটু মুড়িয়া বাদশাহী কায়দায় বসিয়া সম্পাদক মহাশয় আলবোলায় নল টানিতেছিলেন। একদিনে এত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় আমার বিস্ময়-বিহ্বল অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বলিলেন, "আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন ভাই ছাহেব, উজীর রহিম ছাহেবের নতুন হুকুমের এশ্‌তেহার দেখেন নি? টেবিল, চেয়ার, চুরুট সব অন্‌এছলামী কায়দা আর বাঙ্গলা দেশে চল্‌বে না।" এই বলিয়া সম্পাদক

মহাশয় একখানা সবুজ রংএর কাগজ আমার দিকে ফেলিয়া দিলেন, বুঝিলাম এইখানিই উক্ত হুকুম। কিন্তু পড়িয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কারণ তাহাতে এক একটি বাঙ্গলা কথার সঙ্গে ফারসী অক্ষরে খানিকটা করিয়া কি যেন লেখা ছিল। কাগজখানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া বরাবর সেনেট হাউসের দিকে চলিলাম, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সুনীতিকুমার অথবা নাগ মহাশয়ের দ্বারা পাঠ উদ্ধার করাইয়া লইবার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা কিন্তু পূর্ণ হইল না ; ঢুকিতেই চাঁদমার্কা টুপী মাথায় এক চাপরাশী দীর্ঘ দাড়ি নাড়িয়া আমাকে উর্দ্দু ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, যেহেতু আমার দাড়ি নাই অতএব সেনেট হাউসে আমার প্রবেশ নিষেধ। বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি পুরাতন ছাত্র দাড়ি না থাকার অপরাধে সেনেট হলে ঢুকিতে পারিবে না এ রকম আইন তো কোনও দেশে নাই! চাপরাশীকে কি যেন বলিতে যাইতেছিলাম এমন সময় পরিচিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া পিছনে চাহিয়া দেখি চোগাচাপকান-আচকানধারী বাঙ্গলা পাণ্ডুলিপি-বিভাগের দাশগুপ্ত মহাশয়। অল্প দিনেই তাঁহার বেশ একঝাড় দাড়ি গজাইয়াছে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম।

তিনি আমার হাত ধরিয়া একেবারে ফুটপাথে নামাইয়া কহিলেন, "আপনি তো আজকালকার খবর একেবারেই রাখেন না দেখছি। এ হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল ড্রেস, টুপী optional

কিন্তু 'দরবার-ই-এলেমে' ঢুক্‌তে গেলে দাড়ি চাইই—এ উজীর রহিম ছাহেবের হুকুম।" " 'দরবার-ই-এলেম' কি মশাই" জিজ্ঞাসা করিলাম।

দাশগুপ্ত মহাশয় তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিলেন, "আরে মুশকিল! এও জানেন না? ইউনিভারসিটি নাম বদ্‌লে যে আজকাল 'দরবার-ই-এলেম' হ'য়েছে তা' শোনেন নি? আপনি বুঝি এতকাল বাংলা মুলুকে ছিলেন না। তারপর দাড়ির কথা। দাড়ি নৈলে চল্‌বে না; দেখুন না, ডাক্তার নাগ ৫ ফ্রাঙ্ক দিয়ে দাড়ি কিনে এনেছেন ফ্রান্স থেকে; সম্প্রতি ডাক্তার সুনীতিকুমারের নেতৃত্বে প্রাচীন কালের দাড়ির রূপনির্ণয় সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হ'য়েছে, তাঁরা নন্দলালবাবুর সহায়তায় অজন্তা প্রভৃতি স্থান থেকে সেকালের প্রচলিত দাড়ির ছবি উদ্ধার করতে চেষ্টা কর্চ্ছেন, শীঘ্রই এই প্রাচীন ভারতীয় দাড়ির চলন হবে ব'লে আশা করছি। এই আজকেই দেখুন না সিণ্ডিকেটের মিটিংয়ে নূর প'রে আসেননি ব'লে হেরম্ববাবুর Motionএ ষ্টিফেন সাহেবের মেম্বরসিপ ক্যানশেল করা হ'ল। সে যাই হোক্ আপাততঃ আপনি চিৎপুর থেকে একঝাড় 'ঝাঁটা ব্রাণ্ড' দাড়ি কিনে আসুন, পয়সা সাতেক লাগ্‌বে, কাল এখানে আস্‌বেন কথা-বার্ত্তা হবে।" দাশগুপ্ত মহাশয় দাড়ি খুলিয়া পকেটে পুরিয়া ট্রামে চাপিলেন। আমি চিৎপুর মুখে চলিলাম।

জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া মনে হইল রাস্তাটি যেন নূতন। লোকজন চলিতেছে কিন্তু নিঃশব্দে। ফিরিওয়ালারা মাথায় জিনিষপত্র লইয়া নিশানের গায়ে জিনিষের নাম লিখিয়া নীরবে নিশান নাড়িতে নাড়িতে চলিয়াছে। গরুর গাড়ীর চাকায় রবার টায়ার লাগানো হইয়াছে। এমন কি কুকুরগুলার পর্য্যন্ত মুখে ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর নতুন পেটেন্ট করা সাইলেন্সার লাগানো।

একজন কনষ্টেবলকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সে ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রাখিয়া বাঁ হাত দিয়া একটা বাড়ীর দেয়াল দেখাইয়া দিল। দেখিলাম লেখা রহিয়াছে 'সাইলেন্স ষ্ট্রীট্'। তথায় উর্দ্দু ভাষায় একটা নোটিশ, তাহার নীচে ইংরাজীতে লেখা—'এই পথে শব্দ করিলে প্রিভেন্‌শন অফ মিউজিক এ্যাক্ট অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।' চাহিয়া দেখিলাম, পথের মুখে বড় মস্‌জিদ, কাজেই এই হুকুমের কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। নীরবে চিৎপুরে পৌঁছিয়া দাড়ি কিনিয়া হ্যারিসন রোডের মোড় হইতে 'জাহাঙ্গীর' বাসে উঠিয়া শিয়ালদায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কলিকাতা আর ভালো লাগিতেছিল না।

ষ্টেশনে সেদিন দারুণ ভিড়। ঈদ্ কন্‌সেসন লইয়া চাকুরীয়া বাবুরা দেশে ফিরিতেছেন। আমিও একখানি টিকিট কিনিয়া

গাড়ীতে উঠিলাম, কিন্তু স্থান থাকিতেও গাড়ীতে বসিতে পারিলাম না। গাড়ীর ভিতরে উর্দ্দু ভাষায় একটা লেখা আর তাহার নীচে বাঙ্গলা অনুবাদ—"মোট তেত্রিশজন বসিবেক, ২১ জন মুসলমান, ১২ জন হিন্দু।" বুঝিলাম Traffic regulation on population basis আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু বারো জন অনেকক্ষণই জুটিয়াছিল কিন্তু মুসলমান যাত্রী মাত্র দশজন, কাজেই স্থান থাকিতেও বসিতে সাহস করিলাম না। আমারই মত আরো কয়েক জনের সঙ্গে দাঁড়াইয়া প্লাটফরমের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

প্লাটফরমে খবরের কাগজের হকাররা হাঁকিতেছিল, 'ষ্টার অফ্ ইস্পাহান'—এক পয়সা, 'কান্দাহার নিউজ'—দু'পয়সা, 'এছলাম আফতাব'—চার পয়সা। দৈনিক পত্র প্রাতেই পড়া ছিল একখান মাসিক কাগজ কিনিবার অভিপ্রায়ে হাঁকিলাম, "প্রবাসী? প্রবাসী আছে?" একটি ছোক্‌রা ছুটিয়া আসিল, "প্রবাসী নেবেন? রমজান মাসের প্রবাসী, নূতন বেরিয়েছে?"

রমজান মাসের প্রবাসী আবার কি! টাকা দিয়া প্রবাসী-খানা লইয়া দেখিলাম তাইতো, 'প্রবাসী—রমজান' লেখা। আকারে আর কোনও পরিবর্ত্তন নাই শুধু ভিতরে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের' স্থানে লেখা আছে 'খোদা হাফেজ'। স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, এসব হইল কি?

এমন সময় আর একটি হকার হাঁকিয়া গেল, "শনিবারের চিঠি—বিশেষ কোর্‌বানী সংখ্যা, ভালো ভালো কেচ্ছা—ছ'পয়সা"। পয়সা বাহির করিব, এমন সময় গাড়ী ছাড়িল, অসতর্ক ছিলাম ঝাঁকানি খাইয়া পড়িয়া গেলাম।

* * * *

চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখি যে, বেঞ্চের উপর হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছি। সভয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তির দিকে চাহিলাম, দেখিলাম যে তাঁহার প্রশস্ত ললাট অক্ষত রহিয়াছে; রাম নাম জপিতে জপিতে চায়ের দোকানে ঢুকিয়া পড়িলাম।

স্বাধীনতার পালা

চর্চ্চার অভাবে বাঙ্গালীর ইতিহাসটা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন কংগ্রেস-মণ্ডপে রাত্রিতে সহসা অধীত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি হইয়া গেল। গান্ধীজির প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিবার সঙ্কল্প করিয়া আমারই মত জনকয়েক হতভাগ্যের সঙ্গে যেই বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকিয়াছি তৎক্ষণাৎ চারিদিক হইতে চীৎকার উঠিল, "বিশ্বাসঘাতক! রাজবল্লভ!" সর্ব্বনাশ! একদিনে এত সৌভাগ্য! চমকিয়া পকেটে হাত দিলাম, দেখিলাম সীসার সেই অচল সিকিটা ছাড়া আর কিছুই নাই! মনে একটা দুঃখ হইল, নামেই শুধু রাজবল্লভ হইলাম, হায়রে!

কিন্তু বেশীক্ষণ নিজ অবস্থার কথা আর ভাবিতে পারিলাম না, আবার ইতিহাসের নামতা পড়া সুরু হইল সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ঐতিহাসিক আবেশ বোধ করিতে লাগিলাম। কাণের কাছে মুখ লইয়া কে যেন কহিল, 'ধিক্! মীর্জ্জাফর, ধিক্!' মুখ ফিরাইতে যে ব্যক্তির মূর্ত্তি চোখে পড়িল তাহাকে কোনোদিন দেখি নাই, কিন্তু সেই সৈনিকের সাজ দেখিয়া অনুমান করিলাম, হয়তো মোহনলাল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলাম, "কি কর্‌ব বাবা মোহনলাল! ক্লাইভের সঙ্গে লড়াই

কর্ত্তে সাহসে কুলোচ্ছে না। যাহোক্ সিরাজ কোথায় বাপ্ধন ?” মোহনলাল উত্তরে একবার আমাকে ধিক্কার দিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে লাগিল। আমি সভয়ে একটু সরিয়া গেলাম, পলাইব মনে করিতেছি এমন সময় দেখিলাম সম্মুখে নবাব সিরাজ স্বয়ং। শুষ্ক মুখে চশমার ফাঁকে রক্ত চক্ষুতে আমাদেরই দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার নাসারন্ধ্র ক্রোধে ঘন ঘন স্ফুরিত হইতেছে, জরিদার নাগরা বিমণ্ডিত পদ মুহুর্ম্মুহু ধরণীকে আঘাত করিতেছে। তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রিয় সৈনিকগণ সমর ধ্বনি করিতেছে, “শেম ! শেম !” পলায়ন করা আর হইল না। এই নূতন সমর শব্দে আতঙ্কিত হইয়া মুক্তির জন্য একবার ক্লাইভের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম ক্লাইভ নীরবে নতনেত্রে বসিয়া আছেন, সম্মুখে ভীষণ যুদ্ধ, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার আজিকার বেশ কিছু অদ্ভুত মনে হইল ; মাথা কামানো পিছনে একগাছি শিখা মাত্র অবশিষ্ট। ক্লাইভ সহসা অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া গিয়াছেন ; মনে ভাবিলাম নবাব সিরাজের সৈন্যবাহিনী দেখিয়া ক্লাইভ বুঝি শঙ্কায় সঙ্কুচিত। ক্লাইভের চারিদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এই দেশী পোষাক পরিয়া বসিয়া আছেন। কাহারও দিকে চাহিয়া ভরসা পাইলাম না। অগত্যা গালে হাত দিয়া বসিয়া পরিত্রাণের উপায় ভাবিতেছি এমন সময়

একজন সৈনিক ছুটিয়া আসিয়া মিলিটারী কায়দায় হাত ঘুরাইয়া সেলাম করিয়া কহিল, "নবাব! কংগ্রেসের মসনদ্ গেল। বেনিয়া ক্লাইভের জয় হয়েছে!"

সিরাজ ম্লানমুখে কহিলেন, "যাক্!" সিরাজের সৈনিকরা আবার সমর ধ্বনি করিল, "শেম! শেম!"

এই সময় কে যেন পিতৃদত্ত নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিল; মুহূর্ত্তমধ্যে ঐতিহাসিক তন্দ্রা টুটিল, বাস্তব জগতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার পর চক্ষু মুদিয়া কোনক্রমে বাহির হইয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে পথ ধরিলাম।

পথ চলিতেছি, পিছনে পিছনে আরও একজন কে আসিতেছে বোধ হইল। একবার মুখ ফিরাইলাম, দেখিলাম ৺কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বয়ং।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি?'

কমলাকান্ত কহিলেন, "একবার তোমাদের যাত্রার পালা দেখিতে আসিয়াছিলাম—তা মন্দ জমে নাই দেখিলাম।"

অবাক্ হইয়া গেলাম, যাত্রার পালা! কমলাকান্ত কহিলেন, "দুঃখ পাইবে জানিলে বলিতাম না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়া আসিয়াছি, গঙ্গাতীরে তোমার কাছে আর মিথ্যা বলিব না, কিন্তু বাস্তবিকই তোমাদের আস্ফালন দেখিয়া মতিরায়ের

যাত্রার কথা আমার মনে হইতেছিল। মতিরায়ের যাত্রার দলে দুইজন লোক ছিল। তাহারা সমস্ত রাত্রি কুস্থানে পড়িয়া থাকিত। প্রভাত হইতেই স্নান করিয়া সাজ-ঘরে আসিয়া একজন সাজিত ব্রহ্মণ্যদেব অপর জন সাজিত বশিষ্ঠ। মানাইত ভাল। আমি একবার মতিকে বলিয়াছিলাম কিন্তু সে তখন আমার কথা কাণে তোলে নাই; পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আর তোমার মত বালকের কাছে নাই বলিলাম।"

চুপ করিয়া রহিলাম।

কমলাকান্ত কহিলেন, "শুনিতেছ তো? তোমরাও যে তাহাই করিবে তাহা ভাবি নাই, তাই তোমাদিগের আস্ফালন দেখিয়া যাত্রার দলের কথা মনে হইতেছিল।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথার উদ্দেশ্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, প্রশ্ন করিলাম, "ভাল করিয়া বুঝিতেছি না, মনে হয় অনর্থক আমাদের প্রতি অবিচার করিতেছেন।"

কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রুখিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "অবিচার! বরং সুবিচার করিতেছি। তোমাদের ভাগ্য ভাল এ কথা সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া বলি নাই। প্রতিবাদ করিও না। তোমরা কাউন্সিলে গিয়া ইংরেজ রাজার আনুগত্য স্বীকার কর অথচ স্বাধীনতার বক্তৃতা করিতে তোমাদের বাধে না! কোর্টে গিয়া ইংরেজ রাজার আইনের ফাঁস আরও শক্ত করিয়া দেশের

লোকের গলায় টানিয়া দাও অথচ এক রাত্রেই দেশকে ইংরেজের হাত হইতে মুক্ত করিবার সঙ্কল্প তারস্বরে প্রচার কর। তোমরা হইলে কি, বল তো? হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় আমি দিন কয়েক শ্যামবাজারের রাস্তায় ঘুরিয়াছি তখন কতকগুলি লোককে দেখিয়াছি পথে শব্দ হইলেই বৈঠকখানায় ঢুকিয়া তাহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিত। আজ তাহাদিগের জনকয়েককে দেখিলাম স্বাধীনতার ডঙ্কা পিটাইতেছে। তোমাদের মুখে স্বাধীনতার কথা শুনিলে আমার মনে হয় ভূতের মুখে রাম নাম শুনিতেছি।"

"তবে কি স্বাধীনতার নাম মুখে পর্য্যন্ত আনিব না?" জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আনিও না, যেহেতু তাহা হইলে মিথ্যাবাদী হইবে। মনে গোলামী রাখিয়াছ আঠারো আনা মুখে স্বাধীনতার বুক্‌নী কপ্‌চাইয়া লাভ নাই। আর ভাড়াটিয়া দেশপ্রেমিক লেলাইয়া প্রতিপক্ষকে অপমান করিয়াও স্বাধীনতা লাভের কল্পনা করিও না। শুধু বক্তৃতায় স্বাধীনতা লাভের কল্পনা করিও না। শুধু বক্তৃতায় স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যে কাণ্ডটি আজ তোমরা করিয়াছ তাহাতে লজ্জায় আমার আর একবার মরিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমার সূক্ষ্ম শরীরে সকলই তো দেখিলাম। কোথা হইতে হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া একদল ছোকরা আসিয়া স্বাধীনতার জন্য

চীৎকার করিতে সুরু করিয়া দিল। যেখানে জননীরা বসিয়াছিলেন প্রহর রাত্রির শেষেই সেখানে দেখিলাম কেহ নাই। কিন্তু শেষে যখন হাত তোলার পালা আরম্ভ হইল তখন কোথা হইতে এক দল কিশোরী, যুবতী ও প্রৌঢ়া চক্ষের পলকে আসিয়া ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া বসিলেন। তোমরা কি যাদু জান নাকি বাপু হে ?"

"স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদে তাহা কি আপনি বিশ্বাস করেন না ?" প্রশ্ন করিলাম।

"প্রাণ কাঁদে কিনা তাহা বলিতে পারি না, কারণ প্রাণ দেখি নাই। তবে অবকাশ মত তোমরা গোলদীঘিতে কাঁদিয়া থাক দেখিয়াছি। কাঁদিতে অবশ্য তোমাদের কসুর নাই। তোমরা কাউন্সিলের জন্য কাঁদিয়া থাক, কর্পোরেশনের জন্য কাঁদিয়া থাক তাহা আমি জানি। কলের মজুরের জন্যও তোমাদিগকে কাঁদিতে দেখিলাম আর তাহাদের মাথায় লাঠি মারিতেও দেখিলাম। কাজেই তোমরা যে কথা মুখে বল, আমি মাঝে মাঝে মনে করি বুঝি তাহা বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছ। যা'হোক আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই, বাড়ী যাও, বৌমা বোধ হয় ভাত বাড়িয়া বসিয়া আছেন তোমরা কত রাত্রে রণস্থল হইতে ফিরিবে তাহা তো বলিয়া আইস নাই। আমি একবার একজিবিসন হইতে প্রসন্নকে ডাকিয়া লইয়া আসি।"

"কোন্ প্রসন্ন ?"

"কমলাকান্তের প্রসন্ন একজন—প্রসন্ন গোয়ালিনী। তাহাকে চেন না ?"

"নাম শুনিয়াছি ! সে এখানে কি করিতেছে ?"

"লেডী ভলান্টিয়ার না কি একটা তোমরা করিয়াছ তাহাই দেখিতে গিয়াছে। বৈকুণ্ঠে ঐ রকম একটা কিছু না করিলে আর চলিতেছে না। ঠাকুরও মত দিয়াছেন, দেখি এখন কি হয় ?"

কমলাকান্ত ঠাকুর একজিবিসনে ঢুকিয়া গেলেন আমিও চক্ষু রগড়াইয়া দেখিলাম আমার খোলার ঘরখানির দরজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

তিনকড়ি-চরিত

তিনবারের বার জেল খাটিয়া যখন তিনকড়ি বাহির হইল তাহার পূর্ব্বেই তাহার সংসারের একমাত্র অবলম্বন বুড়ী মাসী ধনমণি জলে ডুবিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছিল। ফটকের বাহিরে বন্ধু মদন ময়রার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া তিনকড়ি আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। ফটকের জমাদার হাঁকিল, "ভাগো হিঁয়াসে!" উল্লাসে বাধা পাইয়া তিনকড়ি দুই পাটি দাঁতের সহিত বাঁ-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি জমাদারকে প্রদর্শন করিয়া সদর রাস্তায় উঠিয়া আসিল। জমাদার রাগে জ্বলিয়া বদ্ধমুষ্টি হইয়া ছুটিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সহসা পিছনে জুতার শব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল—ইন্‌স্পেক্টার সাহেব। অগত্যা জমাদার রামভরোস সিং তিনকড়ি বেহারার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি হজম করিয়া অন্তরে জ্বলিতে লাগিলেন।

ইহার পর দুই বন্ধুতে গোপন পরামর্শ হইয়া সাব্যস্ত হইল যে, অতঃপর আইনসঙ্গতভাবে জীবনযাপন করাই সুযুক্তি।

(২)

শীতের প্রভাত। ছোট শহরের বাজার, বাজারের পাশ দিয়া নদী। নদীটির ধারে বাঁধানো বটগাছের তলায় তখনও

সাধুদের ধুনী জ্বলিতেছে। তিনকড়ি সেখানে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল। জটাধারী প্রভু চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "কেয়া বাবা?"

জেলের মধ্যে তাহার কয়েদী বন্ধু ভজন পাঁড়ের সহিত তিন বৎসর একত্র বাসের ফলে হিন্দী ভাষার সহিত তিনকড়ির একরূপ পরিচয় হইয়াছিল, সে দুই হাত জোড় করিয়া জটাধারী বাবার পায়ের কাছে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কহিল, "অধম হ্যায়। অশরণ হ্যায়—"

জটাধারী প্রভু একমুঠা ছাই লইয়া তিনকড়ির কপালে মাখাইয়া দিয়া কহিলেন, "জীতা রহো!"

সমবেত সাধুরা "সীতারাম! সীতারাম!" বলিয়া চ্যাঁচাইয়া উঠিলেন। তিনকড়ির দীক্ষা হইয়া গেল।

সন্ধ্যায় জটাধারী বাবা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন, তিনকড়ি যুক্তকরে শুনিতেছিল। দুইজন সাধু কোন্ মাড়োয়ারীর গদী হইতে সেদিন কিরূপ সিধা আসিয়াছে তাহারই আলোচনায় ব্যস্ত ছিল এবং দুইটি বালক সাধু দিস্তা-খানেক আটার রুটী ঘৃতসিক্ত করিতেছিল। উপদেশ শেষ করিয়া সাধু বাবা কহিলেন, "দুনিয়ামে ইয়ে অমৃত্ হ্যায়্ বাবা।" ভক্ত তিনকড়ি ঘৃতসিক্ত রুটীর দিস্তার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া ভক্তিসরস কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ বাবা।"

(৩)

দিন-পাঁচেকের মধ্যেই তিনকড়ি বুঝিল যে আ[illegible]ভাবে জীবন যাপন করিবার শিক্ষা তাহার একরূপ আয়ত্ত হইয়া গেছে। প্রথম দিন বহুদিনকার অনভ্যস্ত অভ্যাসটি প্রভুর সেবা যোগাইতে যোগাইতে তিনকড়ি ঝালাইয়া লইল। প্রথম প্রথম গঞ্জিকার গন্ধ অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে হইতেছিল, কিন্তু সন্ধ্যা-নাগাদ সেটা সহিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন এক ভক্ত গুজরাটি ঠিকাদার রেলের একটা নূতন পুলের ঠিকা লইয়া জটাধারী বাবার কাছে ভাগ্যগণনা করাইতে আসিয়াছিলেন। সে সময় তিনকড়ি উপস্থিত ছিল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জ্যোতিষ-বিদ্যায় তাহার প্রচুর জ্ঞান জন্মিয়া গেল। তৃতীয় দিন চটকলের কুলীর দলের ছুটি ছিল। তাহারা তিন মাইল রাস্তা হাঁটিয়া সন্ধ্যায় প্রভুর নিকট সীতারামজীর ভজন শুনিতে আসিয়াছিল। জটাধারী বাবা "যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম, যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম" এই দোঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিন টাকা সাড়ে দশ আনা প্রণামী বুঝিয়া লইলেন। তিনকড়ি দোঁহাটি কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া বুঝিল যে কাজ চলিবার মত সীতারাম-তত্ত্ব তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। চতুর্থ দিন তিনকড়ি শিখিল জটাতত্ত্ব। নদীতে স্নান করিবার সময় একটি বালক জটাধারীর জটা অকস্মাৎ স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। সে

তাড়াতাড়ি আসিয়া পুঁটুলি খুলিয়া ভেড়ার লোম বাহির করিল ও তাহাতে আঠা ও ময়দা জুড়িয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুই হাত লম্বা এক জটা বানাইয়া ফেলিল। পঞ্চম দিন জটাধারী প্রভু অতি সঙ্গোপনে কিরূপে তামা সোনা হইতে পারে, এ সম্বন্ধে এক মাড়োয়ারী ভক্তকে উপদেশ দিতেছিলেন। এই ভক্তটি মাসাধিক কাল হইতে 'সিদ্ধাই' লাভের আশায় প্রভুর পিছু লইয়াছিলেন। তিনকড়ি কান পাতিয়া জটাধারী বাবার উপদেশ শুনিল। প্রভু স্বর্ণপ্রস্তুত-প্রণালী কহিয়া চাঁদির টাকাকে মোহর করিবার উপায় সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। তিনকড়ি শুনিয়া বুঝিল যে, প্রভুর নিকট আরও শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখিলে অতি শীঘ্রই যেখান হইতে আসিতেছে সেখানেই ঢুকিতে হইবে, অতএব সে দল ছাড়িল।

দল ছাড়িল রাত্রে। অনেক বিদ্যাই প্রভু তাহাকে শিখাইয়াছিলেন। সে তাহার বহুকালের অধীত বিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রভুকে দিয়া গেল। প্রভু তখন সশিষ্য গভীর সুপ্তিমগ্ন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনকড়ি উঠিল। প্রভুর মৃগচর্ম্ম ও চিমটা, একটা কমণ্ডলু ও একখানা কম্বল সংগ্রহ করিয়া কাঁচির সাহায্যে বাবার দীর্ঘ জটাটি কাটিয়া লইল। পরে খানিকটা বিভূতি বাবার পায়ে ঠেকাইয়া তাহাই কপালে মাখিয়া তিনকড়ি দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

(৪)

পরদিন প্রভাতে গতরাত্রির তিনকড়ি বেহারা বাবা হনুমান-দাস রূপে রামনগরের পথে বাবলাতলায় বসিয়া রুদ্রাক্ষের মালা জপিতেছিলেন আর মনে পূর্ব্বস্মৃতি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতে-ছিল ; এই রামনগরেই তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনকড়ি বন্ধনদশায় পড়িয়াছিল। অপরাধটি সামান্য, পথে চলিতে চলিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তিনকড়ি রামনগরের দেবালয়ে আসিয়া অতিথি হইয়া-ছিল। তখন রাধারাণীজীর ভোগের সময়। পূজারীঠাকুর দেবালয়ে একথালা ফুল্‌কো লুচি বিগ্রহের সম্মুখে রাখিয়া তরকারী আনিতে গিয়াছিলেন, এই অবসরে ক্ষুধিত তিনকড়ি থালাখানি লইয়া প্রস্থান করিল। ভোজন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় ঠাকুরবাড়ীর পুকুরপাড়ে সে ধরা পড়িল। দেবালয়ের সেবায়েৎ গিরিশ চাটুর্য্যের সাক্ষ্যে প্রমাণ হইয়া গেল যে, তিনকড়ি রাধারাণীজীর কণ্ঠহার খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে অবিশ্বাস করিবার হেতু ছিল না এবং আরও দুইবারের ছাপ ছিল, কাজেই তিনকড়ি এবার তিন বৎসরের মত জেলে ঢুকিল। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া একবার রাধারাণীজী ও তাঁহার সেবায়েৎ উভয়কেই দেখিয়া লইবে এ কথাও সকলকে জানাইয়া গেল।

বাবা হনুমানদাস ভাবিতেছিলেন, আর তাঁহার মগজে বর্ষার

ব্যাঙের ছাতার মত প্রতিহিংসা সাধনের নানাপ্রকার উপায় গজাইয়া উঠিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে বাবা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহাদেওজীর ভজন গাহিতে গাহিতে রামনগরের পথ ধরিলেন।

(৫)

দেবালয়ের সম্মুখে অত্যন্ত ভিড়। তীর্থের কাকের মত অতিথিরা প্রসাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া। তাহাদের সম্মুখে ছোট একখানা চৌকিতে বসিয়া সেবায়েৎ গিরিশ চাটুর্য্যে আলবোলা টানিতেছিলেন। তাঁহার গলায় তুলসীর কণ্ঠী, মাথায় টাক, নাকে রসকলি ; পরণে বাসন্তী রঙের একখানি গরদ ফুল কোঁচা দিয়ে পরা। চাটুর্য্যে মহাশয়ের চারিটি স্ত্রী যথাক্রমে নিঃসন্তান অবস্থায় বিষ্ণুপাদপদ্মে বিলীন হইবার পর হইতেই তিনি কণ্ঠী লইয়াছিলেন এবং প্রতিবেশী পীতাম্বর ঘোষালের কন্যাকে পঞ্চম পক্ষে সহধর্ম্মিণী করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মেয়ের বাপের মত ছিল, কিন্তু মেয়েটি তখন ফার্ষ্ট বুক শেষ করিয়া সেকেণ্ডবুক পড়িতেছিল। প্রস্তাব শুনিয়া মায়েব কাছে কেরোসিনে পুড়িয়া মরিবার ভয় দেখাইল, কাজেই প্রস্তাবটি চাপা পড়িয়া গেল। ইহার পরও দিনকয়েক ঘোষালের বাড়ীর পাশ দিয়া স্নান করিতে যাইবার পথে গিরিশ চাটুর্য্যে সুর করিয়া গীতগোবিন্দ গাহিতে গাহিতে যাইতেন। কিন্তু দেবালয়ের দুধের যোগানদার

নিমাই তাহার একটি বিধবা শ্যালিকাকে ঘর-সংসার দেখিবার জন্য আনিবার পর হইতে গিরিশ চাটুর্য্যে স্থির করিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে আর বিবাহ করিয়া সংসারের মায়াজালে জড়াইবেন না। নিমাইয়ের শ্যালিকা মধুমালতী ওরফে মাধি রীতিমত গিরিশ চাটুর্য্যের নিকট হইতে কাশ্মীরী জর্দ্দা, পানবাহার বৃন্দাবনী শাড়ী, সোনার সুতায় গাঁথা তুলসীর মালা প্রভৃতি ইহলোক ও পর-লোকের পাথেয় উপঢৌকন লইত, কিন্তু চাটুর্য্যে মহাশয়ের নিকটে ঘেঁসিত না। রাধারাণীজীর ভোগের অর্দ্ধেক লুচি মাধির জন্য বরাদ্দ ছিল। মাধির বাপ শাক্ত শুনিয়া বাজারের কালীবাড়ী হইতে প্রতি শনিবার একটি করিয়া ছাগমুণ্ড নামা-বলীতে জড়াইয়া চাটুর্য্যে মহাশয় নিমাইয়ের বাড়ীতে পাঠাই-তেন, কিন্তু তাহাতেও মাধি টলিল না। তুক্‌তাক করিয়া মাদুলী বাঁধিয়া মোহনমন্ত্র প্রভৃতি জপ করিয়াও গিরিশ চাটুর্য্যে ফল পাইলেন না। তাঁহার বর্ত্তমান দুঃখের কারণ ছিল ইহাই। এই দুঃখ ঘুচাইতে তিনি একবার 'কামরূপ কামিক্ষে'র দেশে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলেন যে, সে দেশে এমন সব সাধু আছেন যাঁহারা মন্ত্রে ইচ্ছামত যাহাকে তাহাকে বশ করিয়া ফেলেন। কি জানি যদি লাগিয়া যায়—

ঠিক্ এই সময় তেঁতুল গাছের আড়াল হইতে বাবা হনুমানদাস বাহির হইয়া আসিয়া গিরিশ চাটুর্য্যের সম্মুখে

দাঁড়াইলেন। তার পরে চাটুর্য্যে মহাশয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "হোগা।"

কথাটি দৈববাণীর মত চাটুর্য্যে মহাশয়ের কানে বাজিল। তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হোগা, বাবা!"

বাবা হনুমানদাস নিমীলিত নেত্রে কহিলেন, "পূরণ হোগা।"

সহসা গিরিশ চাটুর্য্যের সন্ন্যাসীর প্রতি পরম ভক্তির উদয় হইল। বাবাকে বসিতে আসন দিয়া প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন, "বাবা, আজ এই ঠাকুরবাড়ীতেই—"

বাবা ধীর ও গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মুঠিভর ছাতু ঔর এক লোটা পানি—ঔর কুছ্ নেহি।"

বাবার তিতিক্ষায় চাটুর্য্যে মহাশয় আরও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া গললগ্ন-নামাবলী হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, "মা রাধারাণী, কাঙালের উপর এতদিন বাদ কি দয়া হ'ল মা?"

(৬)

পালঙ্কে শয়ান অবস্থায় বাবা হনুমানদাস মালা জপ করিতেছিলেন। গিরিশ চাটুর্য্যে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া দুই-তিনবার কাশিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি জ্যোতিষ জান্‌তা হ্যায়?"

বাবা উত্তরে একটু মৃদু হাসিলেন। হাসি দেখিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় বুঝিলেন যে জ্যোতিষ-বিদ্যাটা বাবার কাছে একটা সামান্য ব্যাপার। অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে পুনরায় গিরিশ চাটুর্য্যে বলিলেন, "বাবা আমার ললাটমে—"

বাবা উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "সব কুছ্ হ্যায়, লেকিন্—"

গিরিশ চাটুর্য্যে সভয়ে কহিলেন, "লেকিন্ কি বাবা ?"

বাবা গিরিশ চাটুর্য্যের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, "করম চাহি বাচ্চা, করম চাহি।"

ইহার পর বাবা হনুমানদাস গিরিশ চাটুর্য্যের জীবনের ঘটনাবলী স্বচ্ছন্দে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বলিতে বাবার বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, কারণ, তাহার বন্ধু মদন ময়রা রামনগরেরই অধিবাসী এবং দীর্ঘদিন এই দেবালয়ের ভৃত্য ছিল। গিরিশ চাটুর্য্যে সম্বন্ধে সকল তথ্য বাবা তাহার নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। নিজের জীবনের কাহিনী শুনিতে শুনিতে সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে গিরিশ চাটুর্য্যের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছিল। বাবা যখন শেষে চাটুর্য্যে মহাশয়ের আকাঙ্ক্ষিত নারীর নাম পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিলেন, তখন আর তিনি ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, বাবার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিয়া উঠিলেন, "তুমি সবই জান বাবা। এতদিনের সেবার আমার ফল ফলেছে! রাধারাণীজী কৃপা

করেছেন। মায়ের দয়ায় তোমায় পেয়েছি। এ চরণ আর ছাড়ব না।"

বাবা হনুমানদাস নিমীলিতনেত্রে কহিলেন, "হোগা।"

"কব হোগা বাবা? তুমি তো মনের কথা সব জান বাবা। তার জন্যে আমি জলমে ঝাঁপ, সাপের গর্ত্তমে হাত—"

বাবা বাধা দিয়া কহিলেন, "সবুর বাচ্চা! সবুর। বড়ি মেহনৎ। যাগ জপ ঔর বৃন্দাবন কুণ্ডলী—" বলিয়া বাঞ্ছা-পূরণের জন্য আবশ্যক ক্রিয়াদির একটা প্রকাণ্ড ফিরিস্তি দিয়া গেলেন। চাটুর্য্যে মহাশয় আগামীকল্যের যাগযজ্ঞাদির সরঞ্জাম যোগাড় করিতে চলিলেন।

এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়াছেন শুনিয়া মাধি সন্ধ্যাকালে বাবাকে দেখিতে আসিল। ডাকিলেও মাধি আসে না অথচ আজ না ডাকিতেই আসিয়াছে দেখিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় মনে মনে হাসিলেন—বাবার কৃপা হইয়াছে। তাহার পর একটু রসিকতা করিবার উপক্রম করিতেই মাধি ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া বাবার ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। বাবা ধ্যানস্তিমিত-নেত্রের পাতা একটু তুলিয়া অপাঙ্গে আগন্তুককে দেখিয়া লইলেন, আগন্তুক কে তাহাও চেহারা দেখিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং বুঝিলেন যে, গিরিশ চাটুর্য্যের মোহ হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত

হয় নাই। মাধি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাবাকে দেখিতেছিল। ধ্যান ভাঙিলে বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেয়া মাংতা ?"

মাধি একটু মুচকি হাসিয়া বাঁ-হাতের তালু বাবার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া কহিল, "অদেষ্ট—"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হোগা। সোনাদানা হীরাজহরৎ ললাটমে তুম্‌হারা—"

সোনাদানা হীরাজহরতের কথা শুনিয়া মাধির মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

বাবা তাহা দেখিলেন। তখন বাবা বাংলা ও হিন্দী মিশাইয়া মাধিকে ভরসা দিলেন যে, এখান হইতে বিদায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই প্রচুর সোনাদানা তাহাকে দিয়া যাইবেন। তবে বাবার হুকুম মত কাজ করা চাই। মাধির বুক দুরুদুরু করিতেছিল, কথা না কহিয়া মাথা ঝাঁকাইয়া সম্মতি জানাইয়া সে চলিয়া গেল। আশু সোনাদানা প্রাপ্তির ভরসায় মনটা প্রফুল্ল ছিল, যাইবার সময় গিরিশ চাটুর্য্যেকে একটা প্রণামও করিয়া গেল। গিরিশ চাটুর্য্যে মনে মনে হাসিয়া কহিলেন— "এখনও তো বৃন্দাবন কুণ্ডলীই বাকি আছে, কাল বাদ পরশু 'তু' বল্‌তেই—"

সন্ধ্যায় বাবা হনুমানদাস একবার ময়রাপাড়া ঘুরিয়া তাঁহার বন্ধু মদন ময়রার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন।

(৭)

ভোরের প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া প্রভাত হইতে গিরিশ চাটুর্য্যে যাগযজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। সমস্ত আয়োজন অতি সন্তর্পণে এবং গোপনে করিতে হইবে এই আদেশ ছিল, কাজেই আপনাকেই সমস্ত করিতে হইতেছিল। মধ্যাহ্নে উপবাসী চাটুর্য্যে মহাশয় বাবাকে ভূরিভোজন করাইয়া 'বৃন্দাবন কুণ্ডলী' করিবার ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। বাবার আদেশমত মাধি আসিল। বাঞ্ছিতাকে সর্ব্ব অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া তিন হাজার আটচল্লিশবার বাবার প্রদত্ত মন্ত্র সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জপ করিতে হইবে। বাবা সমস্তই মাধিকে বুঝাইয়া দিলেন। মাধি প্রথমে মিহি রকমের একটু আপত্তি করিতেছিল, কিন্তু গিরিশ চাটুর্য্যের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী-গণের পুঞ্জীকৃত অলঙ্কার দেখিয়া তাহার চোখ ঝল্‌সাইয়া গেল, সে আর কথা কহিল না। নিরাপত্তিতে অলঙ্কারমণ্ডিত হইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মধ্যে একবার বাবা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় মাধি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গয়না ফিরিয়ে নেবে না তো?"

বাবা জানাইলেন যে, তাঁহার হুকুম-মাফিক চলিলে গহনা চিরকালের জন্য তাহারই থাকিবে। মাধি খুসী হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গিরিশ চাটুর্য্যে উপবাসে অবসন্ন হইয়া ঢুলিতেছিলেন। বাবা তাঁহাকে ঝাঁকি দিয়া কহিলেন, "গণপতিনাথ কা চরণামৃত পিয়ে লেও বাচ্চা।" চাটুর্য্যে মহাশয় সসম্ভ্রমে চরণামৃতের পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া 'বৃন্দাবন কুণ্ডলী' জপের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাবা সাড়ম্বরে তাঁহার কানে বীজমন্ত্র দান করিলেন এবং রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে চাটুর্য্যে মহাশয় ও মাধিকে দেবালয়ের পশ্চাতে আশশেওড়ার ঝোপের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়া আসিলেন। ঝোপের মাঝখানে খানিকটা স্থান 'বৃন্দাবন কুণ্ডলী' যজ্ঞের জন্য পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল। গিরিশ চাটুর্য্যে মহাশয় পদ্মাসনে বসিয়া মাধির দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মন্ত্র ভুল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। এমন সময় বাবা আসিয়া উভয়কে মুখোমুখী দুই আসনে বসাইয়া জপের প্রণালী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

(৮)

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছিল। মাধি আঁচল দিয়া মশা তাড়াইতেছিল আর মাঝে মাঝে গলার সাতনরটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। চাটুর্য্যে মহাশয় নিমীলিত নেত্রে ঢুলিতে ঢুলিতে বিড় বিড় করিয়া মন্ত্রজপ করিতেছিলেন। জপ যখন দেড় হাজারের কোঠায় গিয়া পৌঁছিয়াছে তখন গণপতিনাথের

চরণামৃতের প্রসাদাৎ নিদ্রাবিষ্ট হইয়া চাটুর্য্যে মহাশয় মাধি গোপিনীর চরণপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। মাধি চাটুর্য্যে মহাশয়কে জাগাইতে যাইতেছিল এমন সময় কে পিছনের ঝোপের মধ্য হইতে কহিয়া উঠিল, "চুপ !"

মাধি মুখ ফিরাইয়া দেখিল, স্বয়ং বাবা। বাবা পরিষ্কার বাংলায় কহিলেন, "চেঁচিও না ! চৌকীদার শুন্‌লে এখুনি বেঁধে থানায় নিয়ে যাবে। গয়না-চুরির ফ্যাসাদে পড়বে—"

মাধি হতভম্ব হইয়া কহিল, "তবে ?"

"চলে এস।" বলিয়া বাবা একরূপ তাহাকে টানিয়াই পথে লইয়া আসিলেন।

গভীর অন্ধকার। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু একখানি গরুর গাড়ী পথে দাঁড়াইয়া ছিল। বাবা মাধিকে তুলিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। মাধি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, চৌকীদারের ভয়ে কথা বলিতে পারিল না। মদন ময়রা ষ্টেশনের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে মাধি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি জাত ভাল তো ?"

তিনকড়ি মিঠাস্বরে কহিল, "তুমি কি জাত আগে বল।"

মাধি বলিল, "বামুনের সোনা গায়ে দিয়ে আর মিছে কইব না, আমরা জেতে বেহারা !"

তিনকড়ি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "আমরাও তাই গো। বাবা তারকনাথ মিলিয়ে দিয়েছেন!" তারপর ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দুইজনের পরিচয় হইল। জীবনের সুখ-দুঃখের সমস্ত কাহিনীই উভয়ে উভয়কে বলিয়া কেহ কাহাকেও ছাড়িবে না বলিয়া বাবা তারকনাথের নামে উভয়েই শপথ করিল।

ভোরের দিকে যখন গিরিশ চাটুর্য্যে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, সালঙ্কারা মাধি রাধারাণীজীর চৌকীতে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে আর তিনি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া বাঁকা হইয়া বাঁশী বাজাইতে-ছেন, সেই সময় বরিশাল একস্‌প্রেস মাধি ও বাবা হনুমান-দাসকে লইয়া শিয়ালদা ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

* * * *

কোথায় বাবা হনুমানদাস আর কোথায় তিনকড়ি বেহারা? কেহই আর এখন নাই। তবে বৌবাজারের মোড়ে 'বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্দেশ' লেখা যে দোকানের সাইনবোর্ড দেখা যায় সে দোকানের মালিকের নাম শ্রীযুত তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্দেশ বলিয়া তাঁহার সন্দেশের চাহিদা খুব। পণ্ডিত মহাশয়েরাও সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহার সন্দেশ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী মাধবী সুন্দরীরও দেবদ্বিজে অগাধ ভক্তি। আলুটোলার মোড়ে স্বব্যয়ে

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া 'মাধবী মনোহর' নামে বংশীধর বিগ্রহ তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তিনকড়ি বাঁড়ুয্যের বাল্যবন্ধু শ্রীমৎ মদনানন্দ স্বামীর উপর বিগ্রহের সেবার ভার অর্পিত হইয়াছে।

মোগল-মদিরা

[নাটিকা]

—কুশীলবগণ—

মিঃ আইচ—অধ্যাপক

মিসেস আইচ—ঐ স্ত্রী

মিস্ অবারিতা আইচ—ঐ বিদুষী কন্যা

সুলোচনা—অবারিতার বান্ধবী

চূড়ামণি সিদ্ধান্ত—মিঃ আইচের ছাত্র ও অবারিতার প্রেমাকাঙ্ক্ষী

গ্রেবিয়েল বরদাচরণ গোমেষ ... ঐ

এফ্. মোরাদ ... ... ঐ

বিনোদিনী—মিঃ আইচের ভগ্নী

বাবুর্চ্চি।

—প্রথম দৃশ্য—

(সময়—রাত্রি একপ্রহর)

[মিঃ আইচের বাড়ীর সম্মুখের বাগান। একটি পচা ডোবা, তাহার ধারে বাঁশের মাচায় পুঁই। চারিধারে আশশ্যাওড়ার ঝোপ, তাহাদের মাথা কাঁচি দিয়া ছাঁটা। দূরে সদর রাস্তা। পুঁইমাচার নীচ হইতে চূড়ামণি গা চুলকাইতে চুলকাইতে বাহির হইয়া আসিলেন।]

চূড়া। উঃ কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! মশার কামড়ে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। কত রকম গ্যাস আর ব্যাসিলি পেটের ভিতর ঢুকছে—আর উনি স্বচ্ছন্দে ব'সে ছাতের উপর উর্দ্দু গজল গাইছেন! ধিক্ নারী! নিষ্ঠুরা হৃদয়হীনা—কে যেন আসছে! মহা উৎপাত। (অন্তরালে গেলেন।)

(গোমেষের প্রবেশ)

গোমেষ। নাঃ, আজই শেষ ক'রে যাব! Holy Mary, আর সহ্য হয় না। কোথায় সাড়ে আটটা আর কোথায় পৌনে দশ! এই সওয়া এক ঘণ্টা আশশ্যাওড়ার বনে ব'সে! সময়-জ্ঞান বাঙ্গালীর আদৌ নেই আর এই জন্যেই এ জাত ধ্বংস হবে!

(চূড়ামণির প্রবেশ)

গোমেষ। কে ও!

চূড়ামণি। হুঁ। গোমেষ! তুমি কেন চাঁদ, পিঁজরাপোলে না গিয়ে পরের বাগানে চরে বেড়াচ্ছ?

গোমেষ। Shut up চূড়ামণি! এখানে পাণ্ডাগিরি ফলিও না বল্‌ছি! হ্যাংলা কুকুরের মত মিস্ আইচের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াও, এদিকে বামনাইটা ঠিক বজায় রেখেছ!

চূড়ামণি। জাত তুলো না, খবর্দ্দার!

[দূরে ছাতের উপর হার্ম্মোনিয়াম বাজিয়া উঠিল,
সেই সঙ্গে গান আরম্ভ হইল।]

গোমেষ। (মাটিতে বসিয়া পড়িয়া) জুলিয়েট! জুলিয়েট! Frailty thy name is woman!

চূড়ামণি। কি হ'ল গোমেষ!

গোমেষ। সবই তো জান ভাই, আর কেন জিজ্ঞেস্ কর্চ্ছ! মিঃ আইচের কাছে পড়তে পার্ব্ব ব'লে হু' হুবার ইচ্ছে ক'রে ফেল করেছি। I. C. S. হবার আশা জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়েছি। মায়ের Illuminated Bibleখানা American tourist-এর কাছে বিক্রি ক'রে মিস আইচের পায়ের সাঁচ্চা জরির নাগরা কিনে দিয়েছি। বাবার ব্যাঙ্গা-লোরের বাড়ী তুলতে যা খরচ হয়েছে হোটেলের বিল আর ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েছি তার দুনো। তবু—তবু—

চূড়ামণি। আর আমার কি হ'য়েছে, গোমেষ? আজ

দুটি বছর ছায়ার মত সাথে সাথে ঘুর্‌ছি। ভুবনেশ্বরের মন্দির অবারিতার ভাল লেগেছে শুনে নিজের বাপের পরিচয় দিয়েছি উড়ে। তাকে খুশী রাখবার জন্যে শূওরের শিক্‌কাবাব এক টেবিলে ব'সে খেয়েছি—আর চোখ বুঁজে ভেবেছি—বন্যবরাহ খাচ্ছি। জাত ধর্ম্ম সব খুইয়ে শেষে———

গোমেষ। তুমি তো তাকে বিয়ে কর্ব্বে না বলেছিলে, চূড়ামণি!

চূড়ামণি। বিয়ে ছাড়া কি প্রেম হয় না, গোমেষ? আমি শুধু প্রেমটুকুই চেয়েছি—তার বেশী নয়।

গোমেষ। আর আমি চেয়েছিলাম তাকে বিয়ে কর্ত্তে! আজ এইখানে পাকা কথা হবার কথা ছিল—কিন্তু বুঝ্‌ছি সে আসবে না।

চূড়ামণি। কেমন ক'রে জান্‌লে, গোমেষ?

গোমেষ। শুন্‌ছ? ঐ মোরাদের গলা শোনা যাচ্ছে—ছাতে গান হচ্ছে! আর আমরা এখানে ছাতের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে মশার কামড় খাচ্ছি! C. S. P. C. A. থাকলে cruelty to animals-এর জন্যে মিস আইচের জরিমানা হত!

চূড়ামণি। গোমেষ! (গোমেষ নিরুত্তর) গোমেষ শুন্‌ছ?

গোমেষ। হুঁ।

চূড়ামণি। হাতে হাত দাও। (উভয়ে করবদ্ধ হইয়া) বল! প্রতিশোধ নেবে?

গোমেষ। কেমন করে?

চূড়ামণি। বল, নেবে!

গোমেষ। নেব।

চূড়ামণি। মোরাদকে সরাব। তারপর যার ভাগ্যে হয় হবে। তবে এটুকু জেন গোমেষ, যদি তুমি বিয়ে কর্ত্তে চাও, আপত্তি কর্ব্বনা। কিন্তু ছকু দপ্তরীর নাতি Grand Mogul সেজে এসে মুখের গ্রাস সরিয়ে নেবে, তা হবে না। কাল স্পষ্ট অবারিতাকে জিজ্ঞেস কর্ব্ব কি তার মতলব! তারপর ব্যবস্থা। আর থাক্‌তে পারিনে, কাল সকালে মেসে দেখা হবে, এসো। (প্রস্থান)

গোমেষ। কিছু বুঝছিনে। আমাকেও ডেকেছে, চূড়ামণিকেও ডেকেছে, ওদিকে মোরাদেরও গান হচ্ছে। কাল স্পষ্ট কথা শুন্‌তে হবে।

(প্রস্থান)

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[ছাত। চারিধারে গণ্ডা চারেক কাঁধভাঙা টব; তাহাতে মেদি হইতে আরম্ভ করিয়া কালকাসিন্দা পর্য্যন্ত যাবতীয়

গাছের চারা। ছাতের আলিসায় দুই জোড়া লক্কা ও লোটন। ছাতের উপর একটা জাপানী টেবিল, তাহার এক কোণে একটা আলবোলা, মাঝখানে একটা মিনিয়েচার তাজমহল। বুটিদার গোলাপী রংয়ের পায়জামা পরিয়া মিস্ অবারিতা আইচ পায়চারী করিতেছিলেন।]

অবারিতা। যৌবন! সোনার যৌবন! অফুরন্ত যৌবন! সমুদ্রের মতই এর হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই! বুঝি সৃষ্টির প্রথম দিনে যৌবন আর Atlantic Ocean দুটি বোন হাত ধরাধরি ক'রে উঠেছিল! সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা দু'জনারই। কত রাজা, কত সেনাপতি, কত জাহাজ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে তলিয়েছে এই আটলান্টিকে, তবু এর ক্ষুধা মেটেনি। তেমনি যৌবনের পাথার আমার। কত—থাক্‌গে—পড়া বই আর পাল্‌টে প'ড়ে লাভ নেই। তবু ভাব্‌তে ইচ্ছা করে। এ যৌবনের পাথারে যারা ভরাডুবি হ'য়েছে তাদের কথা ভাব্‌তে ইচ্ছে করে। আহা বেচারীরা! কত ফিলজফারের ফিলজফি, কত পি-আর-এস-এর থিসিস, মিউজিক মাষ্টারের বাঁশী, কবির কাব্য এ তরঙ্গে পড়ে বান্‌চাল হ'য়ে গেল। জানে সবাই, তবু নৌকো ভাসানো চাই-ই ; হায়রে ছেলেমানুষ!

(সুলোচনার প্রবেশ)

সুলো। হ্যাঁলো বারি!

অবা। কে ভাই স্থলো! এস এস!

স্থলো। এ কি শুনছি বারি! বিয়ে কর্চ্ছিস না-কি?

অবা। এখনও বল্‌তে পারিনে ঠিক। সন্ধ্যা নাগাত বল্‌তে পার্ব্ব।

স্থলো। ভাগ্যবান্‌টি কে?

অবা। তাও ঠিক করিনি। সে কথাও শুন্‌বি সন্ধ্যায়। তবে একজনকে বিয়ে কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্ছি বটে।

স্থলো। কাকে?

অবা। মোরাদ।

স্থলো। কোন্ মোরাদ? থার্ড ইয়ারে পড়ে, স্থর্ম্মা চোখে দেয়?

অবা। শুধু ওইটুকু নয়। শাজাহানের নাতি বাহাদুর শার চতুর্থপক্ষের বেগমের পিস্‌তুত বোনের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর প্রথম পক্ষের শালার নাতির নাতি সে—সে Grand Mogul এর বংশধর। ওফ্, শাজাহান! শাজাহান!! ময়ূর সিংহাসন আর তাজমহল! সিনেমার ছবির মত চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে সব! দেখে এলাম আগ্রায় মর্ম্মরপাথরে বাদ্‌শার বেদনা যে মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠেছে। দেখেই কেমন যেন হ'য়ে গেলাম। মনে হ'ল আমিই যেন মমতাজ বেগম! ভাব্‌তে ভাব্‌তে চক্ থেকে কিনে ফেল্‌লাম এই পায়জামা আর ওই

আলবোলাটি। এই আলবোলার নল মুখে দিলেই সেই হীরা জহরতের স্বপ্নলোকে চলে যাই—

স্নলো। আজকাল তামাক খাচ্ছ তা হ'লে ?

অবা। মোরাদ এনে দিয়েছে সওয়া পাঁচ টাকা ভরির বাদশাহী তামাক। আশ্চর্য্য হ'য়ো না স্নলো। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখে এসে গুণ্ডী খাওয়া অভ্যাস করেছিলাম, গোমেষের কাছে মিলানের গীর্জ্জার ছবি দেখা অবধি ইতালিয়ান চুরুট টানা স্নরু করেছি, শুধু উড়িষ্যার কারুশিল্প আর গথিক স্থাপত্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ রাখবার জন্যে। আজ যে এই আলবোলা টান্‌ছি এও এই জন্যে।

স্নলো। বুঝলাম, তাহ'লে মোগল-সম্রাজ্ঞী হওয়াই ঠিক করেছ। আমার শুধু দুঃখ হচ্ছে গোমেষ আর চূড়ামণির জন্যে। এ দুটির যে কি হবে!

অবা। কিছু হবে না স্নলো। এ দুটিকেও জীবনের সাথে গেঁথে আমি রাখব। এক ফুলে কি তোড়া হয় ?

স্নলো। বুঝছিনে ভাই, হেঁয়ালীর মত লাগ্‌ছে।

অবা। স্পষ্ট করে বলি শোন। ভালবাসা আমার কাছে একটা 'আর্ট।' যা কিছু স্নন্দর মহান্ সবই ভালবাসি আমি, জান তো ? ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখে তাকে ভাল বেসেছিলাম, সে ভালবাসা দিলাম চূড়ামণিকে—শুনলাম যখন যে তার বাপ

উড়ে। মিলানের গীর্জ্জার ছবি ছবিতে দেখে হৃদয়ে এই নির্ব্বাক সৌধটির প্রতি প্রেম জন্মাল—সে প্রেম নিবেদন কর্ল্লাম গোমেষকে। গোমেষের ঠাকুর্দ্দার পিসে ইতালিয়ান আর তার মামীমার ঠাকুরমা ছিলেন স্প্যানিশ। কি চমৎকার আর্টিষ্টিক বংশ, কিন্তু তবু—তবু—(দীর্ঘশ্বাস)

স্নুলো। ও কি বারি ?

অবা। তবু পাচ্ছিনে। তবু গোমেষের আর্টিষ্টিক বংশে মিশে যেতে পাচ্ছিনে। Ginger Beer যেমন tumbler ছাপিয়ে ওঠে তেমনি মোগল-মদিরা আমার হৃদয়-বোতলে উপ্‌চে উঠছে, তাতে ছুটো Rock salt দানার মত গলে গেছে ইতালি আর উড়িষ্যার শিল্প-প্রতিভা। গীর্জ্জার গম্বুজ আর ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়ো খাটো পড়ে গেছে আজ তাজমহলের মিনারেটের কাছে। সেই অভ্রভেদী—ও কি! চম্‌কালে যে ?

স্নুলো। দোরের পর্দ্দাটা নড়ে উঠল। কে যেন দাঁড়িয়ে।

অবা। নিশ্চয় মোরাদ! কুণ্ঠায় আস্‌তে পাচ্ছে না। বড় ভালো লাগে মোরাদের এই শাহাজাদা-সুলভ সঙ্কোচ। এস মোরাদ!

(মোরাদ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিলেন।)

স্নুলো। তবে আমি আসি ভাই বারি।

অবা। এসো। সন্ধ্যায় যদি এসো তবে তোমার 'নিজামী' খানা নিয়ে এসো।

স্থুলো। সে তো কাছে নেই ভাই, জাষ্টিস সমাদ্দারের ভাইঝি নিয়ে গেছেন।

অবা। বলছি, যদি পাও—

স্থুলো। হ্যাঁ আন্‌ব, তবে আসি। (প্রস্থান)

অবা। (মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে) কেন শাহজাদা ?

মোরাদ। সেই কথাটি শুন্‌তে চাই—

অবা। আচ্ছা মোরাদ, তুমি ফার্সী শেখনি। নিতান্ত পক্ষে উর্দ্দু ?

মোরাদ। (স্বগত) বাপ্‌! ক খ শিখ্‌তে লেগেছে দেড় বচ্ছর তার ওপর আবার ফার্সী! (প্রকাশ্যে) কিছু কিছু।

অবা। তবে তোমার মোগলাই ভাষায় আমায় একটু আদর কর লক্ষ্মীটি! (মোরাদের মাথায় হাত দিলেন। মোরাদ অবারিতার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া গান আরম্ভ করিল।)

মোরাদ। (গান)

যব সে লাগি তেরা আঁখিয়া

দিল্ হো গিয়া দেওয়ানা।

তুম লায়লী হো ম্যঁয় মজনু
তুম শেরা হো ম্যঁয় খসরু
তুম গুল হো ম্যঁয় বুল্‌বুল
তুম শামা হো ম্যঁয় পরওয়ানা।

অবা। তুম শাহাজাদী, ম্যঁয় শাহাজাদা—এ কথাটা কোন রকম ক'রে জুড়ে দিতে পার মোরাদ ?

মোরাদ। বাড়ী থেকে তৈরী ক'রে আন্‌ব তবে। শুধু সেই কথাটির জন্যে—

অবা। আজ সন্ধ্যায় সব বল্‌ব। (মোরাদের চিবুক ধরিয়া) তুমি তো দেওয়ানা হ'য়েছ, যদি বোরখার দরকারই হয় তবে—

মোরাদ। খোদা জানেন সে নসীব আমার হবে কি-না।

অবা। (স্বগত) আর একটু জ্বালাই! (প্রকাশ্যে) তবে সারাদিন খোদার কাছে আজ তোমার আরজ পাঠাও। সন্ধ্যায় বুঝলে ? কি পাও না পাও সে জান্‌তে পার্ব্বে সন্ধ্যায়।

মোরাদ। (স্বগত) বাপের অগাধ পয়সা। কোনও রকমে মোল্লা ডেকে কাজ খতম কর্‌তে পার্‌লে অন্ততঃ বিলেতটা ঘুরে আস্‌তে পার্ব্ব। (প্রকাশ্যে) তবে আসি আমার সুলতানা —বন্দেগি—

(কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান)

অবা। রক্তের ধারা যাবে কোথায়? কি চমৎকার কুর্নিশ কর্ব্বার ভঙ্গী। হাতখানা চট্ ক'রে কেমন ক'রে কপাল থেকে ঠোঁটের কাছে নেমে আসে। একটুখানি ছুঁয়ে যায় যেন। কি আদবকায়দা। ডান হাত খানা যখন গলা জড়িয়ে ধ'রে—তাতেও কি মোগলাই সতর্কতা। অফ্ মোগল। গ্রাণ্ড মোগল।

(বাবুর্চ্চির প্রবেশ)

বাবুর্চ্চি। দিদি সাব্।

অবা। বেগম সাহেবা বল্‌তে পারিস্‌নে আলীজান? তা তোকে ব'লে লাভ কি, বদ্ধ কালা তুই। তা সেকালে মোগল রাজপুরীতে প্রহরীর কাজে কালা বোবা আর খোজাই থাক্‌ত।

বাবুর্চ্চি। রস্থই কি হবে দিদি সাব্?

[অবারিতা দুই হাত পাখীর ডানা নাড়িবার ভঙ্গীতে নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন]

অবা। কাবাব! কাবাব!

বাবুর্চ্চি। জী হুজুর। (প্রস্থান)

(ত্রস্তপদে মোরাদের প্রবেশ)

মোরাদ। দুশ্মন! দুশ্মন! (অবারিতার অঞ্চলে মুখ লুকাইলেন)

অবা। কি মোরাদ! কি?

মোরাদ। চূড়ামণি আর গোমেষ ষড়যন্ত্র করেছে আমাকে খুন কর্ব্বে। আস্‌ছে তারা।

অবা। ভয় কি, আমার চিড়িয়া, আমার জহরৎ? আমার দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস্, আমার কোহিনূর, আমার কুতবমিনার—

(নেপথ্যে পায়ের শব্দ)

তুমি ওই চোরা দরজা দিয়ে নেমে বাবুর্চ্চিখানার ড্রেণ টপকিয়ে বিছুটি বনের মাঝখান দিয়ে যাও চলে। ভয় নেই, আজ যারা দুশ্মন কাল তারা দোস্ত হবে। (মোরাদের প্রস্থান)

এমনি চোরা সিঁড়ি সেকালে সব বেগমের কাম্‌রাতেই থাক্‌ত। এমনি চুরি ক'রে দেখা, এমনি প্রাণ নিয়ে পালানো —সবই মিলে যাচ্ছে।

(চূড়ামণি ও গোমেষের প্রবেশ)

চূড়া ও গোমেষ। কোথায় মোরাদ?

অবা। কেন?

চূড়া। তোমার জন্যে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে—জাত ধর্ম্ম—

গোমেষ। ইচ্ছে ক'রে দু'বার ফেল্ ক'রে—মায়ের ক্যাসবাক্স ভেঙে—

অবা। প্রেমের জন্যে কত কি কর্ত্তে হয় তা জান দোস্ত? খিলিজি বংশ এই প্রেমের বাজারে বিকিয়ে গেল। মোগল—

চূড়া। চুলোয় যাক্ মোগল! শেষকালে ফাঁকি দিলে! মোরাদকে বিয়ে কর্চ্ছ শুন্‌ছি!

অবা। তাতে দোষ কি? এক জনকে বিয়ে কর্চ্ছি ব'লে পুরোনো বন্ধুদের তো ছাড়্‌ছিনে চূড়ামণি! তোমার ভুবনেশ্বরের মন্দির চিরকাল মনে থাক্‌বে আমার! (মাথায় হাত দিয়া) একথা সত্যি! সত্যি!! সত্যি!!!

চূড়া। আঃ! (স্বগত) মায়াবিনী সব রক্ত জল করে দিলে!

অবা। আর তুমি এস গোমেষ। আরও কাছে এস! একদিন বলেছিলাম তুমি দাঁতে আর আমি বিয়াত্রিচে—সে কথা ঠিক্ রাখ্‌ব জেনো। যাকেই বিয়ে করি তোমাকে ভুল্‌ব না।

(গোমেষের চিবুক স্পর্শ করিলেন)

গোমেষ। আমি যে বড় বেশী আশা করেছিলাম।

অবা। সে আশা হয়তো একদিন পূর্ণ হবে। বিয়ে তো আমার একটা খেয়াল, চিরকাল যে একজনেরই থাক্‌তে হবে তার কোনও মানে নাই। তবে আজ মোরাদকে ভালো লাগ্‌ছে, মোরাদ ব'লে নয়, সে মোগল ব'লে!

চূড়া। মোরাদ মোগল! চুট্‌কী বাঁদীর ছেলে সুলতান শা?

অবা। আমার স্বপ্ন ভেঙে দিও না চূড়ামণি! মমতাজ

বেগমের আত্মা আমার মধ্যে আজ উঁকি দিচ্ছে, মোরাদের কথায়বার্ত্তায় ভাবভঙ্গীতে আমি শাজাহানের ছবি দেখ্‌ছি। এ স্বপ্ন ভেঙো না! যাও বন্ধু, চ'লে যাও—তিন দিনের মত চ'লে যাও। আসি তবে।

(কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান)

চূড়া। এ ভূত মোরাদের ঘাড়েই চাপা উচিত গোমেষ। তুমি হজম কর্ত্তে পার্ব্বে না ভাই, এসো। (প্রস্থান)

—তৃতীয় দৃশ্য—

(একতলার বারান্দা। মিঃ আইচের ভগ্নী বিনোদিনী। রাস্তায় গাড়ী।)

বিনো। নে নে, তোরঙ্গ দুটো তুলে দে।

(মিঃ আইচের প্রবেশ)

মিঃ আইচ। কি বিনো! বাক্স প্যাঁটরা—

বিনো। চল্‌ছি আমি।

আই। কেন?

বিনো। তা আবার জিজ্ঞেস কর্চ্ছ? তোমার মেয়ে যে ঐ মোরাদ ছোঁড়াটাকে বিয়ে কর্ব্বে শুন্‌ছি—

আই। তাতে কি? মোরাদকে যদি তার মনে লেগে থাকে তবে—আর তা ছাড়া বংশে—

বিনো। ও বংশের গোড়ায় আমি কুড়ুল মারি। নে নে তোরঙ্গ—

আইচ। Biology পড়নি বিনো, বুঝ্‌বে না! Cross breed-এ—

বিনো। হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি। তোমরা কুকুর কেন্‌বার সময় বংশ দেখ, মেয়ে বিয়ে দেবার সময় যাকে পাও তাকেই—নে তোরঙ্গ।

আইচ। ছুটো দিন থাক্‌লে না। ছুঃখ রইল—

বিনো। ভেবো দাদা, যে তোমার বিনো মরেছে। তোমার মেয়ের ছেলে এসে নানী ব'লে ডাক্‌বে তো! সে ডাক আর শুন্‌ছিনি, নে তোরঙ্গ—

আইচ। ছুটো দিন থাক্ না বিনো।

বিনো। থাক্‌তে পারি যদি তোমার মেয়ের ছেলে কি জাত হবে বুঝিয়ে দিতে পার। কি হবে সে?

(অবারিতার প্রবেশ)

অবা। সে হবে Indo-Saracenic architecture-এর একটা সজীব নিদর্শন! বুঝ্‌লে পিসি—দেখেছো কখনো আগ্রার তাজমহল, সেকেন্দ্রা দেখেছো—

(মিসেস্ আইচের প্রবেশ)

মিসেস্ আইচ। তুই থাম্ না বারি! উনি যেতে চাইছেন,

কেন গাড়ী মিস্ করিয়ে দিবি মিছিমিছি! তুমি এসো ঠাকুর-ঝি!

বিনো। হ্যাঁ বৌ সেই ভাল, আমি আসি। নে তোরঙ্গ ছুটো—

(প্রস্থান)

আইচ। বিনোটা চ'লে গেল!

অবা। (স্ব) মোরাদের আস্‌বার সময় হ'লো। (প্রস্থান)

আইচ। বিনোটা চ'লে গেল!

মিসেস্। যাক্ না! খামোকা কেন তাকে ফেরাতে চাও? তারা পছন্দ করে না এসব! মোরাদের বাপের চামড়ার ব্যবসায় কত টাকা খাটে তার খবর যদি জান্‌তেন তবে—

আইচ। টাকার কথা তুলো না! টাকা আমি চাইনি—আমি চেয়েছি তুর্কী আর বর্ত্তমান ভারতের সভ্যতার একটা Inter-mixture, একাজে বুকের পাটা চাই। বারির বুকে সে বল আছে আমি জানি। আরও ছ'চার জন—পুনা, দেরাদুন, গয়া, কলকাতায় এই সভ্যতায় Inter-mixtureএর ব্রত নিয়েছেন জানি। ইতিহাসে এঁদের সঙ্গে আমার বারিরও নাম থাক্‌বে।

(অবারিতা উৎফুল্ল হইয়া প্রবেশ করিলেন।)

অবা। মা! মা! দোয়া দাও! চাট্টি জাফ্‌রাণের গুঁড়ো

আমার মাথায় ছিটিয়ে আশীর্ব্বাদ কর—আমি মোরাদকে পাকা কথা দিয়েছি!

মিসেস্। বেশ করেছিস মা! ওগো! তুমি আশীর্ব্বাদ কর!

আইচ। Long and happy life! তা হ'লে A. P.-তে খবরটা দিয়ে দি! (প্রস্থান)

অবা। মা! তোমাদের আইবুড়ো ভাতের মত ক'রে আজ তোমার নিজ হাতে পেস্তা বাদাম আর কিস্‌মিস্ দিয়ে আমাকে দুটো আইবুড়ো পোলাও ক'রে দিও। আর আমার টেবিলের সম্মুখে সেই মিনিয়েচার তাজমহলটি বসিয়ে দিও, আর মোরাদের জন্যে সেই জরির তাজটা বের ক'রে দিও। আমার সাথেই খাবে সে আজ!

মিসেস্। এক সঙ্গে কত ফরমাসই যে কর্লে! পাগ্‌লি—
(প্রস্থান)

অবা। মোগল! গ্রাণ্ড মোগল! তবু—তবু মনে পড়ছে চূড়ামণির সেই অভিমান-ফোলা গাল দুটো আর গোমেষের ছল ছল দুটি চোখ। যাক্ গে, আজ দুটো দিন আর তাদের কথা ভাব্‌বো না! মোরাদ বসে রয়েছে নতুন একটা গজল শোনাবে ব'লে—

(প্রস্থান)

(লোকজনের ব্যস্ত যাতায়াত)

[নানারূপ বাতিদানে হরেক রকম রংয়ের মোমবাতি। আতর-দান, গোলাপ-পাশ—বিস্তর রকমের বরসজ্জা। পায়জামা পরিয়া অবারিতা—মুখে বোরখা।]

অবা। যাক্, এতদিনে নৌকা ভিড়োলাম একঘাটে। আবার কবে নোঙর তুল্‌বো খোদা জানেন। কিন্তু এরা আমাকে ভুল করেছে। স্থুলো আসেনি। পুরোনো বন্ধুদের কেউ কেউ এসেছেন। কেউ খুশী হ'য়েছেন, কেউ মুখ ভার করেছেন। গোমেষ, চূড়ামণি কেউ এলো না—বোধ হয় মুষড়ে গেছে! যাক্, তুদিন বাদেই দেখব আবার।

(মিসেস্ আইচের প্রবেশ)

মিসেস্। কি রে বারি, বলেছিলি কেউ আস্‌বে না! তা দেখেছিস্—কত প্রোফেসর ব্যারিষ্টার জজ এসেছিল, সবাই তোকে ধন্যি ধন্যি করে গেল। আর তোর পুরোনো বন্ধুরা যা সব প্রেজেণ্ট পাঠিয়েছে তাতে তো ঘর বোঝাই হ'য়ে গেল। শনি-সংঘ থেকে তাঁরা পাঠিয়েছেন তুটো চমৎকার কট্‌গ্লাসের বোতল, তার একটাতে সোমরস আর একটাতে আঙুরের আরক। ভাবকুমার প্রধান পাঠিয়েছেন একটা মোটা হাদিসের বই, তার পাতায় পাতায় মুক্তা বসানো। মধুকর কাঞ্জিলাল

পাঠিয়েছেন গরুর মাথায় তৈরী একটা গোলাপ-পাশ, তাতে চমৎকার মীনার কাজ; দিবাকর শর্ম্মা পাঠিয়েছেন দেওয়ানী খাসের মডেলে তৈরী একটা প্যারাম্বুলেটার; সব্যসাচী সার্ব্বভৌম পাঠিয়েছেন সকলের চেয়ে চমৎকার জিনিষ, একখানা ছুরী তার বাঁটে একটা বোতাম। সে বোতামটা টিপলে আপনা হ'তেই ছুরির ফলা আড়াই পোঁচ চলে! দিব্যি জিনিষটি!

অবা। দু জনের কথা বল্‌লে না মা!

মিসেস্। কে কে?

অবা। চূড়ামণি আর গোমেষ?

মিসেস্। তাদের প্রেজেণ্টও দামী, তবে কি কাজে লাগবে জানি নে। চূড়ামণি পাঠিয়েছে উড়িষ্যার মিহি কাজ করা একটা পিতলের কলসী আর গোমেষ পাঠিয়েছেন সিল্কের এক গাছা মোটা Rope, খাস মিলানের তৈরী!

অবা। তা হ'লে তারা আমাকে ভোলেনি! প্রেম অমর! বিয়ে চাপা পড়েও সে মরে না। মনে থাক্‌বে চূড়ামণি, মনে থাক্‌বে গোমেষ, তোমাদের অপূর্ব্ব এই উপহারের কথা! তবে চল মা, আমাকে একটু এগিয়ে দাও—বাইরের তাঞ্জামে মোরাদ ব'সে রয়েছে। বিদায় গোমেষ! বিদায় চূড়ামণি! বিদায় মা আমার! (প্রস্থান)

—যবনিকা পতন—

অভিসার

[বন্ধুবর গহন গুহের ডায়েরী হইতে]

বি-এ ফেল করিয়া ঘর ছাড়িলাম। মাতৃকুল পিতৃকুলের ত্রি-সীমানায় কেহ ছিল না; সুতরাং গতি আমার অবাধ।

ফেল করিয়া দুঃখ করি নাই; সংবাদ শুনিয়া কবিতার খাতার প্রথম পাতা খুলিয়া কহিলাম, "ওগো তোমারই জন্যে এই যে ব্যর্থতা—এ তো আমার পুরস্কার। কোনো দুঃখ, কোনো ক্ষোভ নাই!" অক্ষরগুলি কথা কহিল না; কিন্তু যাহার উদ্দেশে রচিত এই ছন্দের মালা, তাহার প্রসন্ন উজ্জ্বল তৃপ্তিভরা চক্ষু দুটি স্পষ্ট খাতার পাতায় ফুটিয়া উঠিল।

সে আমার কৈশোরের আনন্দের স্বপ্ন—মঞ্জুলতা। মঞ্জুলা বলিয়া ডাকিতাম। আমার প্রতিবেশিনীর তেরো বৎসরের কন্যা। এনট্রান্স পাশ করিয়া সহরে গেলাম। এফ-এ পাশ দিয়া ফিরিয়া শুনিলাম, মঞ্জু অপরের গৃহ আলো করিতে চলিয়া গেছে। সে দিনের সেই আঘাত! সে কী নির্ম্মম!

কবিতার মধ্যে স্বস্তি খুঁজিলাম। দিনের পর দিন বিচিত্র ছন্দে আমার খাতার পাতায় জীবনের এই মূর্ত্তিমতী কামনার স্তব ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু এই খাতাখানি ছাড়া

পৃথিবীতে আর কোন বন্ধন ছিল না। কলেজের বহির দিকে চাহিতেই মনে হইত ইহাদের জন্যই মঞ্জুকে হারাইয়াছি। পুঁথির পাতায় মন বসিত না। বি-এ ফেল করিলাম।

(২)

ঘর ছাড়িয়া যে দিন বাহির হইলাম, সে দিন প্রদোষে কেবল প্রথম দক্ষিণের হাওয়া মুকুলিত তরুলতাকে আন্দোলিত করিয়া গেছে। সন্ধ্যার শেষে জ্যোৎস্নারাত্রে বাহিব হইলাম। দূর হইতে ফিরিয়া একবার পিছনে চাহিলাম—নিরুদ্দেশের যাত্রী, জীবনে আর এ গৃহে ফিরিব কিনা জানিনা। যদি কখনও মঞ্জুকে ভুলিতে পারি ··কিন্তু সে ব্যর্থ প্রয়াস কেন? আজ এই মরু জীবনের যাহা কিছু আনন্দ, সে তো তাহারই কল্পনায়! মঞ্জু আজ ষোল বছরের। ষোলটি বসন্তের রূপ ও আনন্দের অপূর্ব্ব সঞ্চয় আজ অপরের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আছে। শুধু আমি রিক্ত, আমি নিঃস্ব, আমি একা। কোনো লক্ষ্য ছিল না; দুই বৎসর ভারতের নানাস্থানে ঘুরিলাম। হৃদয়ের রিক্ততা ঘুচিল না, শুধু কবিতার খাতা মঞ্জুলতার নব নব রূপ-বন্দনায় ভরিয়া উঠিল।

মাঝে মাঝে মনে একটি খোঁচা লাগিত—মঞ্জু পরস্ত্রী। পর মুহূর্ত্তেই মনের এ দুর্ব্বলতা মুছিয়া ফেলিতাম। শাস্ত্র আর

হৃদয়ের বিরোধ চিরকালকার। জানিতাম হৃদয় যাহাকে চাহে, শাস্ত্র তাহার বিচিত্র বিধি-নিষেধের যবনিকা দিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিতে চায়। তারপর প্রেম! সে কোনো বন্ধন, কোনো সংস্কার, কোনো নিষেধ মানে না। মঞ্জু আজ পরস্ত্রী, দুর্লভ। মনে ভাবিতাম ইহাই বিধাতার বিধান··· আমার হৃদয়কে ব্যর্থতায় ভরিবার জন্য, আমার কবিতাকে সার্থক করিবার জন্য।

দিনগুলি কাটিত একরকমে, কিন্তু রাত্রি? সে তাহার অপার নিস্তব্ধতা দিয়া বাঞ্ছিতার অঞ্চলের মত আমাকে ঘিরিয়া রাখিত। কখনও গভীর নিশীথে আবিষ্টের মত উঠিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া ডাকিতাম, "ওগো এস, এস! দুর্ব্বহ এ জীবন তোমা ছাড়া!"

হৃদয়ের ক্ষুধা যখন অসহ্য হইয়া উঠিত তখন কাব্য খুলিয়া বসিতাম। উচ্চকণ্ঠে পড়িতাম কিনা জানি না। তবে একদিন বাড়ীর মালিকের মুখে শুনিলাম যে, আমার নৈশ অধ্যয়ন অপর সকলের অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে। কথা কহিলাম না, আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম ধন্য আমি! যুগ যুগ সঞ্চিত রস-আনন্দে ভরা এই যে কাব্য ইহার উপভোগের সৌভাগ্য শুধু আমার একেলার! কি সৌভাগ্য! কি গৌরব!!

সে গৃহ ছাড়িলাম।

(৩)

নগাধিরাজ হিমালয়। তাহারই সানু দেশে এক নিভৃত পল্লীতে আসিয়া বাস লইলাম এক মুদীয়ানীর গৃহে। মুদীয়ানীর দোকানের পাশে একটি চালা ঘর প্রবাসী তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই ঘর অধিকার করিলাম। মুদীয়ানীর বিগত জীবনের কাহিনী শুনিলাম—সংক্ষিপ্ত অথচ করুণ। সাহারাণপুরে তাহার পিতৃগৃহ হইতে প্রথম যৌবনে এক বাল-বিধবাকে যে পুরুষ ভুলাইয়া আনিয়াছিল, তাহার ক্ষুধা নারীর যৌবন ফুরাইতেই ফুরাইয়া গেল ; আজ সে কোথায়, হতভাগিনী তাহা জানে না। মুদীয়ানী চক্ষু মুছিল। আমার জীবনের কাহিনী তাহাকে বলিলাম। সে কহিল, "তাহাকে পাইবে বাবু। স্বপ্নে, কল্পনায়, ধ্যানে আজ যাহাকে পাইতেছ, সত্য হয় যদি তোমার প্রেম, তবে এক দিন নিশ্চয় তাহাকে পাইবে।" সার্থক হোক্ নারী, তোমার আশীর্ব্বাদ!

গিরিমূলের সেই নিভৃত চালা ঘরে মঞ্জুলতার ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইত যেন মঞ্জু আসিতেছে—সুদূরের পথ বাহিয়া আসিতেছে সে, কত মরু অরণ্য পার হইয়া আমারই এই কুটীর খানির দিকে। মুদীয়ানীকে কহিলাম। সে কহিল, "একথা সত্য বাবুজী, এমন ব্যাপার পূর্ব্বেও ঘটিয়াছে। এই গ্রামেই……।" তারপর গ্রামেরই

এক বিরহী গোপপ্রণয়ীযুগলের মিলনের ইতিহাস। সে এক জ্বলন্ত প্রেমনিষ্ঠার কাহিনী।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। সেই কৃষ্ণ গিরিমালার প্রতিচ্ছবি আকাশের দর্পণে ফুটিয়া উঠিল আষাঢ়ের মেঘে, গিরি-কদম্বের শাখা-প্রশাখা ফুলে ফুলে শিহরিয়া উঠিল। অশ্রান্ত বর্ষণ! প্রকৃতির কি অভিনব চমৎকার রূপ এ! যক্ষ বিরহীর মিলন ঘটিয়াছিল, সেও কি এমনই বর্ষায়? প্রতিদিন মনে হইতে লাগিল, এ বর্ষা ব্যর্থ যাইবে না, মিলন হইবেই। এই পুঞ্জ কদম্বকেশর দিয়া রচিত হইবে আমাদের মিলন-শয়ন গিরি-পল্লীর এই নিভৃত কুটীরে! রাত্রিতে যেন মঞ্জুর কিঙ্কিণী ধ্বনি শুনিতাম, প্রতিদিনই যেন সে ধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া আসিতে লাগিল।

সেদিন শ্রাবণ সন্ধ্যায় গিরি বনানী পূরব হাওয়ার তাণ্ডব তালে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তরু আর লতায় নিয়ত আলিঙ্গন, মেঘ আর বিদ্যুতে সঙ্গ, গিরি নদীটির নব যৌবনস্রোতে উপল-খণ্ডগুলি ডুবিয়া মরিতে চাহিতেছে। শুধু আমি একা! আমি একা!

আজি এই মিলন-চঞ্চল প্রকৃতির মধ্যে সে কি আসিবে না? ক্ষুধিত রহিয়া যাইবে এই বুক, শূন্য রহিয়া যাইবে এই শয়ন!

মুদীয়ানী কহিল, "এমন রাতেই মিলন হয় বাবুজী। আশা ছাড়িও না।"

মঞ্জুর কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ; সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গভীর রাত্রি। শব্দ কিসের! টুং টুং! এ যে তাহারই কিঙ্কিণী ধ্বনি, এতো আমি চিনি ; আমি চিনি! শৈশব হইতে এ শব্দ আমি চিনিয়াছি। টুং-টুং-টুং! ওগো এস! ওগো এস! যে বাহু আলঙ্গিয়া ও কনক-কিঙ্কিণী ধন্য হইয়াছে, সে বাহু আমার কণ্ঠে জড়াইয়া দাও, ওগো এস!

রাত্রি দ্বিপ্রহর। টুং-টুং-টুং! সেই ধ্বনি একেবারে আমারই গৃহতলে! এত কাছে! আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠিল সর্ব্ব অঙ্গে ; আবিষ্টের মত উঠিলাম, বাহু মেলিয়া কহিলাম, "যদি আসিয়াছ তবে আর কেন লজ্জা, কেন দ্বিধা। বুকে এস, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হোক্!"

আবার সেই কিঙ্কিণীর ধ্বনি অতি স্পষ্ট, অতি মধুর আমারই দ্বারপ্রান্তে। দুয়ার খুলিয়া কহিলাম, "এস! ওগো এস, এই মুক্ত দ্বারপথে—মুক্ত হৃদয়ের পথ দিয়া এস!"

টুং টুং! এবার স্পষ্ট শুনিলাম এই কিঙ্কিণী ঝনৎকারে বাঞ্ছিতার আমন্ত্রণ! বাহিরে আসিলাম, গভীর অন্ধকার! আমার ঘরের বারান্দায় এক কোণে তাহাকে দেখিলাম

অতি সঙ্কুচিতা আসন্ন মিলনের আনন্দলজ্জায়। আবার কিঙ্কিণী ধ্বনিয়া উঠিল টুং-টুং-টুং!

আর পারি না গো আর পারিনা! একটি চুম্বনে আজ সুদীর্ঘ ব্যথাতুর বিরহের সমাপ্তি হোক্। বাহু মেলিয়া চির-বাঞ্ছিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দ-উদ্বেল স্বরে কি কহিলাম জানিনা।

এমন সময় মুদীয়ানী বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "বাবুজী?"

স্বপ্নাচ্ছন্ন চক্ষু দুটি মেলিয়া প্রদীপের স্তিমিত আলোকে দেখিলাম—আমার দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধকণ্ঠ মুদীয়ানীর বিরাট্ শ্বেত রামছাগলটি! বেচারী তখনও মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহার গলার ঘণ্টা বাজিতেছে টুং-টুং-টুং।

আমার ঘরের পিছনে এটা বরাবর বাঁধা থাকিত। আজ ঝড়ের উৎপাতে বারান্দায় উঠিয়া আসিয়াছিল।

সেই অবধি রাত্রে কাব্য চর্চ্চার অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছি।

———

ক্ষতিপূরণ

['বাস্তবিকা'র অন্যতম সদস্য কোরক করের ডায়েরী হইতে]

শনিবারের সন্ধ্যাকালে সে দিন দক্ষিণ-বাতাস মনটাকে দোলা দিয়া গেল।

রবিবার প্রাতে যখন ঘুম হইতে উঠিলাম তখনও সে দোলুনি থামে নাই। ছুটির দিন ; চাদরখানি গায়ে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ফাল্গুন প্রভাতের মিঠা রৌদ্র তখন গড়ের মাঠের গাছের ভিজা পাতায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিলাম। কোথাও যাইবার কোনও তাড়া ছিল না ; বসন্ত প্রভাতের এই বিচিত্র মাধুরী দিয়া মনটিকে পরিপূর্ণ করিয়া লইলাম।

গির্জ্জার ঘড়িতে ন'টা বাজিল। চমক ভাঙ্গিল। হঠাৎ মনে হইল স্থবিরের মত এক স্থানে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি-উপভোগের আনন্দের চেয়ে আরো কিছু চাই। আজ ছুটির দিনে মনকে নব নব আনন্দের পথে চলিতে দিতে হইবে। চক্ষু মুদিয়া একবার অনুভব করিয়া লইলাম…মনের আনন্দের ক্ষুধা তখনও মিটে নাই।

"বই চাই ?" মুখ ফিরাইলাম। বগলে রঙ্গীন্ মলাটের বিলাতী ম্যাগাজিন লইয়া 'হকার' দাঁড়াইয়া। তার সমস্ত মুখখানিতে প্রত্যাশার আলো। 'চাহিনা' বলিতে পারিলাম না, একখানি কিনিলাম। বহির পাতায় নিবিষ্ট হইবার মত মনের অবস্থা নহে, কাজেই চকিতের জন্য একবার মনে হইল আট আনা পয়সা ব্যর্থ গেল। যাক্, তবু সে বেচারীর প্রত্যাশা তো ব্যর্থ হয় নাই।

"ট্যাক্সি! দাঁড়াও!"

"কোথায় যেতে হবে ?"

"চল সোজা! ভবানীপুর, কালীঘাট যেখানে হয়!" মন সাড়া দিল, 'চল! নব নব আনন্দের পথে…'

ট্যাক্সি চলিতেছে। তার সম্মুখে পশ্চাতে অসংখ্য ট্রাম; বাস—যাত্রীতে ভর্ত্তি। ছ' পয়সা ভাড়া। ট্যাক্সির মিটারে চাহিলাম, এক টাকা আট আনা! কোথায় ছ' পয়সা আর কোথায় এক টাকা আট আনা! মন কহিল,—'তুচ্ছ এই অর্থের পরিমাণ! আনন্দের পথে চল, আজ ছুটির দিন, ভুলের দিন, ক্ষতির দিন…'

ঠিক্! ভুলের দিন, ক্ষতির দিন! "এইবার দাঁড়াও!" ট্যাক্সি থামিল। নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিলাম—লক্ষ্যহীন! মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, শুধু তাহার

মধ্যে একটু বেস্থরা বাজিতেছিল ছুটি কথা—ছ' পয়সা—দেড় টাকা! মন কহিল, 'আনন্দের কোনও দাম নেই! অমূল্য এ পদার্থ জীবনে আর নাও আসিতে পারে…'

ঠিক্! ঠিক্! বসন্তের প্রভাত, দক্ষিণের হাওয়া—ভুল আর ক্ষতি-ই তোমাদের উপযুক্ত উপচার! বিনিময়ে আনন্দের আশীর্ব্বাদ—সে তো অমূল্য!

জগুবাবুর বাজার! ভিড়, ঠেলাঠেলি! বসন্ত প্রভাতের অপূর্ব্ব শ্রীর মাঝে নিতান্ত কুৎসিত দৃশ্য—অনাবশ্যক! মন কহিল, 'দেখিয়া লও! তোমার মতন ভাগ্যবান্ সকলে নহে, বসন্ত প্রভাতের আনন্দের উপভোগ সকলের ভাগ্যে জোটে না…ছু'পয়সার তরকারী কিনিতে ছু'ঘণ্টা দর-দস্তুর।' ফাল্গুন প্রাতের মিঠা রৌদ্র ইতিমধ্যে প্রখর হইয়া ওঠে। উপভোগের সময় ইহাদের নাই!

ঠিক্।

"সর্ব্বনাশ হয়েছে 'নক্ষি'! তিনকোশ মাটি হেঁটে চার সের পটোল আন্‌লুম, বেচে এক পয়সা লোকসান!"

মন যেন একটু দোল দিল। তিনক্রোশ মাটি—চার সের পটোল—এক পয়সা লোকসান! কথাগুলির মধ্যে অনেকখানি বেদনা ছিল, মনকে স্পর্শ করিল। চকিতের জন্য মনে হইল, ছ'পয়সা—দেড় টাকা!

"একটি পয়সা ছেড়ে দাও গো দোকানী,—একটি পয়সা দর কম ব'লে কালীঘাট থেকে আস্‌ছি—"

একটি পয়সার জন্য কালীঘাট থেকে জগুবাবুর বাজার! মনে আবার ঘা লাগিল। আবার চকিতে মনে হইল ছ' পয়সা—দেড় টাকা। বগলের ম্যাগাজিন খানি যেন এবার কথা কহিল, 'আমি আছি আট আনা।' তুইটাকা। মন কহিল, 'আনন্দের দাম নেই, চল চল তামা আর রূপার চাকীর গোলকধাঁধা থেকে...'

ঠিক্। আনন্দের দাম নেই! কিন্তু তবু অনেকক্ষণ ধরিয়া মনের আনন্দলোকের মধ্যে তুটি টাকা মাথা ঠোকাঠুকি করিতে লাগিল।

কে ও? ট্রামের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া এই ফাল্গুনের প্রভাতে মূর্ত্তিমতী বসন্তশ্রীর মত? ধীরে ধীরে কাছে আসিলাম, কোনো সঙ্কোচ নাই, আমাকে দেখিয়াই কহিল, "শ্যামবাজার যাব।" এস্রাজে যেন সাহানার কোমল গান্ধার বাজিল! কি অপূর্ব্ব রূপ, কি শোভন সজ্জা! শাড়ীর জরির পাড়খানি পর্য্যন্ত আমার মনের তালে তালে দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপিতেছিল। আর কানের তুটি তুল মুহুর্মুহু ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিতেছিল, সে কি রৌদ্রে না তাহার কপোল-স্পর্শের পুলকে! তাহার কুন্তলগন্ধ, তাহার অঞ্চলে বাঁধা গোলাপের সুবাস, তাহার চক্ষুর দৃষ্টি,

তাহার কথা, সমস্ত মিলিয়া আজ প্রভাতের আনন্দের অভিযানকে সার্থক করিয়া দিল।

মন কহিল, 'কেমন? ক্ষতিপূরণ হইল তো?'

কোনো সন্দেহ নাই। সার্থক আজিকার প্রভাত, সার্থক আজিকার ভুল, সার্থক আজিকার ক্ষতি। এই ভুল এই ক্ষতি জীবনের প্রতিদিনকার সঙ্গী হোক্!

আমার বসন্ত প্রভাতের অভিযানকে কৃতার্থ করিয়া সমস্ত ক্ষতিকে পূর্ণ করিয়া সুন্দরী চলিয়া গেল শ্যামবাজারের ট্রামে। চলন্ত ট্রামখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

শিয়ালদার ট্রাম আসিল। উঠিয়া বসিলাম। আনন্দের নেশায় তখনও মন আবিষ্ট হইয়া আছে।

"বাবু, টিকিট?"

বিরক্ত দৃষ্টিতে লোকটির দিকে চাহিয়া মনিব্যাগ বাহির করিতে গেলাম, কোটের পকেটের অপর দিক্ দিয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ডান হাতখানি বাহির হইয়া গেল। পকেট কাটা! মনিব্যাগ নেই!!

মনটাকে উপুড় করিয়া কে যেন সহসা সমস্তখানি আনন্দকে বাহির করিয়া দিল, দক্ষিণ হাওয়ায় বিশ্রী রকম শীত বোধ করিতে লাগিলাম, মূর্ত্তিমতী বসন্তের শোভা সেই শ্যামবাজারের যাত্রীটির কথা মনে হইতেই দুইপাটি দাঁত একসঙ্গে আসিয়া ঠেকিল। তাহার জন্যই……

বাসায় যখন ফিরিলাম তখনও মনিব্যাগটির টাকা সিকি আধুলী দু'আনী ও একআনী গুলি মনের রিক্ত ভাণ্ডারের পৈঠায় আর্ত্তনাদ করিয়া মাথা খুঁড়িতেছে। ছুটির দিনের প্রভাতটি অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়া মনে হইল, কাটা পকেটটির দিকে চাহিয়া একেবারে উপরে চলিয়া গেলাম!

মেছুনীরা তখন সবেমাত্র বাক্স হইতে পুকুরের বরফ-চাপা 'টাট্‌কা' রুই বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেহ কেহ গত সন্ধ্যার কাৎলার টুক্‌রাকে অলক্ত সহযোগে 'তাজা' করিয়া তুলিতেছে। আমি বৌবাজারের বাজারে দু'টা কুমড়া ফুলের সন্ধানে ঘুরিতেছি। এমন সময় হঠাৎ আমার নাম শুনিয়া পিছন ফিরিলাম, একটি ভদ্রলোক ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির ভঙ্গীতে আঙ্গুল বাঁকাইয়া আমাকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার পায়ে লাল নাগরা, পরণে খদ্দরের জরিপাড় কাপড়, গায়ের পাঞ্জাবীর একটি আস্তিন গুটান। চোখে সোণার স্প্রিং চশমা, তাহার নীচে দুটি চক্ষু, তাহার কোটরের গভীরতা প্রায় এক ইঞ্চি। মাথায় রুক্ষ এলোমেলো লম্বা চুলের নীচে গুপ্ত টেড়ী, বগলে ফাল্গুন-সংখ্যা "কল্লোল"।

চকিতে ভদ্রলোককে দেখিয়া লইয়া কহিলাম, "বলুন ?" তিনি কহিলেন; "আপনাকে শোনাতে চাই আমার একটা কবিতা। আপনি কবি।" আশ্চর্য্য হইলাম, আমি কবি! কহিলাম, "ভুল করেছেন আপনি। আমি শ্যামবাজার যেতে [illegible] ট্রামে উঠিনে, নোট ভাঙ্গিয়ে টাকা বাজিয়ে এবং গুণে

নিই, দক্ষিণের হাওয়া যখন বয় তখন জানালা খুলে আকাশের দিকে চেয়ে জেগে থাকিনে বরং সে রাতে বেশী ঘুমোই। আমি কবি নই। আপনি আমাকে অন্য কেউ মনে করেন নি তো?" ভদ্রলোক মিহিসুরে কহিলেন, "দেখুন ভুল করা আমার স্বভাব বটে, প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অযুত ভুলচুক নিয়েই আমার কারবার, তবু আজ আমি ভুল করিনি। আপনি চমৎকার পয়ারে কেচ্ছার বই লিখেছেন। যে ছাপাখানায় সেটা ছাপা হচ্ছে তার কাছেই আমার বাসা। তারপর এখানেই দূর থেকে আপনাকে আমি লক্ষ্য করছিলাম, বারবার ওই দোকানে বসা মেয়েটিকে দেখে আপনার চক্ষু ক্ষুধিত আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছিল, আমি দেখেছি।"

ক্ষুধিত আনন্দে চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল বটে—কিন্তু কশাইয়ের মেয়েটিকে দেখিয়া নহে, দোকানের লম্বমান চর্ম্মহীন নধর ছাগনন্দনকে দেখিয়া; কিন্তু সে কথা বলিতে লজ্জাবোধ করিলাম। কবি হইবার এমন সুযোগ ছাড়িতেও কেমন একটু কুণ্ঠাবোধ হইতে লাগিল, কহিলাম, "আপনাকে দেখছি ভাঁড়াবার উপায় নেই! আচ্ছা পড়ুন কবিতাটা। কিন্তু দেখবেন, আমাকে আবার সকালেই ফিরতে হবে।"

ভদ্রলোক খপ্ করিয়া আমার হাত ধরিয়া মিনতি-করুণ

কণ্ঠে কহিলেন, "হোক্ না দেরী, হোক্ না দেরী। নাই ফিরলেন আজকে বাড়ী, সকাল বেলা!"

কুক্ষণে ফস্ করিয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "গিন্নী আছেন, দেবেন ঠেলা।" শুনিয়াই এক হাতে আমার গলা ধরিয়া ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "এইতো! এইতো! আত্মগোপন কর্ব্বেন আপনি আমার কাছে? আমি কবি! নিখিলের বুক থেকে যত গোপন আনন্দ-রস আমি—"

বিপদ্ গণিলাম। বাড়ীতে ছেলেটি ভুগিতেছে, হয়তো গৌরচন্দ্রিকা শুনিতেই ন'টা বাজিবে, কহিলাম, "কবিতা আরম্ভ করুন। দেরী সৈবে না!"

ভদ্রলোক পকেট হইতে গোলাপী রংয়ের একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন, "তার আগে কাহিনীটা শোনাই। ওই যে দেখছেন কেরোসিনের বাক্সটা, তার সাম্নে ওই গামলা, তার উপরে ওই তক্তাখানা, তাতে রক্তের দাগ—জানেন ওটা কি? মাছের রক্ত ও নয়, আমার হৃদয়ের রক্ত এ! ওখানে বসে নিত্যকালী, এখুনি আসবে সে, কুসুম-পেলব পদতল দিয়ে বৌবাজারের কঠিন ফুটপাথ ধন্য ক'রে আসবে সে, নিত্য যেমন আসে। লীলাপদ্মের মতন ক'রে বাঁ হাতে দোক্তার ডিবেটি নিয়ে চাঁপাতলা থেকে সে আস্‌বে, আজ এক বৎসর এম্‌নি ক'রে সে আস্‌ছে। আমার হৃদয়ের নৈবেদ্যকে পাষাণ-প্রতিমার মত

উপেক্ষা করেছে সে সুকঠিন তিরস্কারে, কিন্তু আমার গতিকে সে করেছে চলন্ত, হৃদয়কে করেছে ফলন্ত, কবিতাকে জীবন্ত করেছে। এ লাইন ক'টি তারই বন্দনা। শুনুন—

নিত্যকালী নিত্যকাঙ্গ আমার এ বন্দনা রসাল
শুনাইতে চাহি তোরে।
তোমার এ জীবনের পুঞ্জীভূত যতেক জঞ্জাল
ধৌত ক'রে দিতে চাহি উচ্ছ্বসিত কবিতার স্রোতে,
সেই দিন হ'তে—
যেদিন আসিলে তুমি নবীন মুদীর সাথে
মগরা হাটের পথে অন্ধকার রাতে
এগারোটি ছেলে মেয়ে ফেলে,
অবহেলে
অন্তঃপুর বন্দীশালা হ'তে,
মুক্তির কামনা নিয়ে যুক্তির সীমান্ত অতিক্রমি
নানাস্থান ভ্রমি
চম্পক-বরণী অয়ি চম্পকতলার গলি 'পরে
কাতু বাড়ীওয়ালীর ঘরে।
সেই দিন হ'তে—
কলেজের পথে
যেদিনে হেরিনু তোমা উড়ে পানওয়ালার সাথে

করিতেছ সুখালাপ—
সেই দিন হ'তে যত গান
ক্ষুধায় অধীর হয়ে তোমারেই করিছে সন্ধান !
তারপর বৌবাজারে
আঁশবটি নিয়ে দেবী প্রতিষ্ঠিত হ'লে বেদীপরে
হে নির্ম্মমা নিলে শত বলি—
রুই কাৎলার রক্তে ধৌত হ'ল তব পদতল
মোর মর্ম্মতল
ভেদ করি দিনু রক্ত তার সাথে ;
উঠে পুলকিয়া
'রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী
শৃঙ্গারের হিয়া'।
নিত্যকালী, নাহি জান কি দারুণ পিপাসা আমার
অঙ্গগ্রন্থি দেয় শুষ্ক করি !
বদন ব্যাদান করি শরীরের যত লোমকূপ
'জল খাই' 'জল খাই' কহিছে চীৎকারি !
শৃঙ্খলিত হস্ত মোর জল নিতে নাহি পারে ;
এতো নহে সে পিপাসা—
যারে সোডা ওয়াটারে নিভে ;
কিংবা বরফের কুচি

গালে দিলে যাবে ঘুচি।
এযে মোর শাশ্বত পিপাসা ;
সেই পুণ্য উষাকালে এ দেহের শুভ জন্মদিনে
দুগ্ধ সঞ্চারের সাথে জননীর স্তনে
চিত্ত-ডালে বেঁধেছিল বাসা
হুলুধ্বনি শঙ্খরব আনন্দ-মন্দ্রিত
আঁতুড় ঘরের মাঝে—
তারপর ষষ্ঠীপূজা দিনে
পিপাসায় শুষ্কপ্রায় এ রসনা লেহনে লেহনে
নিজ গণ্ড দিল লাল করি,
তবু ঘুচিল না তৃষা। জল লাগি পথে পথে ফিরি।
নিত্যকালী! নিত্যকালী! নিত্যকাল ধরি
পিপাসার অভিসার মম
তোমার কলসী পানে ;
তার মাঝে আছে কিবা 'রম' 'তাড়ী' অথবা 'শ্যাম্পেন'
সুধাস্নিগ্ধ কেন
উঠিতেছে ফেনায়িত হ'য়ে নাহি জানি তাহা।
শুধু জানি আমি যে পিপাসী
নিত্য শত বর্ষ কাল আছি উপবাসী,
চিরন্তন একাদশী মোর,

পারণ হইবে কবে দ্বাদশীর সে ঠিকানা নাই।
তাই জল চাই
গলা ভিজাবার লাগি ;
শুষ্ককণ্ঠে কেমনে বা গাই তোমার বন্দনা-গাথা ?
নিত্যকালী! দিনু বলি তোমার ও ক্ষুধিত চরণে
মোর সবি স্থির জেনো মনে
হবিষ্যাশী হইনু মৎস্যাশী,
মাছ লওয়া থলিখানি হাতে
ও কর পরশ লোভে শ্যামবাজারের মোড় হ'তে
আমি আসি নিত্যকাল হ'তে
উছলিত জনস্রোতে
ভাসিতে ভাসিতে
বহুবাজারের সিন্ধুকূলে।
রতন-মাণিক্ মম! আমি কবি জানাই শপথ
কভু পথ ভুলে
যাই নাই টেরিটি বাজারে।
তারপর সকলের আগে
থলি আগাইয়া ধরি এতটুকু লাগে
যদি ছোঁওয়া তব দাঁড়ি পাল্লাটির সাথে!
দাম দিই যাহা চাহ,

পিপাসা দুঃসহ তবু নাহি ঘুচে মম।
জানি সখি! জানি
মোহিনী এ লুকোচুরি খেলা
অনাদি অনন্ত কাল হ'তে
খেলিতেছ তোমার এ কবিটির সাথে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক জাগে হেরি তব লীলা অভিরাম—
এগারো ছটাক দিয়ে একটি সেরের লহ দাম,
ভেট্‌কী চাহিলে দেহ রুই—
প্রশান্ত তৃপ্তির সাথে হাস্যমুখে থলিমাঝে থুই।
তৃষিত হৃদয় মম স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে লীলাময়ী।
মোর চুম্বনের ফণা
ইহজীবনেতে আর দংশন করিতে পারিল না
তোমার ও আরক্ত কপোল—
উদ্যত হইয়া উঠি বারবার নেত্র ভঙ্গিমায়
শঙ্কা পেয়ে ফিরে রসনায়।
তাই দেহ দিতে চাহি দান।
শাশ্বত এ দেহ মোর জন্মান্তরে নিতে চাহে প্রাণ।
জন্মান্তর—অনন্ত সুন্দর,
পঙ্কিল বিশীর্ণ দেহ তারে দিতে চাহি অবসর
শুষ্ক অভিসার হ'তে।

নিতে চাহি প্রাণ
নব উন্মাদনা নিয়ে, নিয়ে তৃষা, নিয়ে নব আশা
জ্বলন্ত লালসা নিয়ে।
সে লালসা ঝক্‌ঝকি প্রদীপিবে সর্ব্বাঙ্গ আমার
যবে সেই জ্যোৎস্না নিশাকালে
গদাই মাল্লার জালে
উঠিব ইলিশ রূপে, ক'ব চুপে চুপে
সাথীদের কাছে মোর—যাই নব রূপে
তারি পাশে নব অভিসারে!
দত্ত-পুকুরের এঁদো পুকুরের পঙ্কের মাঝারে
ব্যথা-কণ্টকিত তনু কৈ হয়ে রব নিত্যকাল
তোমারি পরশ আশে ;
আনন্দ-নন্দিত তনু নিখিল বন্দিত
কাৎলা হ'য়ে আসি যদি তাহে নাহি ক্ষোভ,
পরশের লোভ
জীয়ায়ে রাখিবে প্রাণ।
চিত্ত বলি দিনু যেথা সেথা নব দেহ
নিত্যকালী, দিব বলি—
পেলব শ্রীকরে কাটি
বারো আনা সের দরে তুমি দিবে বাঁটি,

আঁশবঁটি স্পর্শ মাত্র শোণিতে জাগিবে শিহরণ
সুখের মরণ !
মোর দেহ বিনিময়ে অঞ্চলে তোমার
টাকা সিকি করিবে ঝঞ্চন ;
মুখে হাসি উঠিবে খল্‌খলি।
আমি যাব চলি
নানা দিকে ভরি থলি অথবা ঠোঙ্গায়
রুমালে গামছায়
গাহিতে গাহিতে গান।
তারপর তপ্ত-তৈলে চট্‌পটি গাহিব এ গাথা
ঘৃত ও পলাণ্ডুরসে বিচর্চ্চিত ভুলে যাব ব্যথা,
অবশেষে পড়িয়া থালায়
অন্তরের মর্ম্মে মর্ম্মে হাসি কব
যায় যায় যায়
আজিকে পিপাসা মম।
নিত্যকালী ! আজি মোর সাঙ্গ হ'ল চির অভিসার
এই কালিয়ার রূপে—
দুইটি ক্ষুধিত আঁখি, জিহ্বা লেলিহান
ওই দংষ্ট্রা দেখা যায়—
নিত্যকালী করিনু প্রয়াণ !

এই সময় আমার রসনা অত্যন্ত সরস হইয়া আসিল, কহিলাম, "চুপ্ করুন! আর নয়!"

ভদ্রলোক আমার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "আপনার রসনাও তো তৃষিত হ'য়ে উঠেছে দেখ্ছি, চাট্ছেন? কেমন লাগ্ল?"

আমি কহিলাম, "চমৎকার! আরও ভালো লাগ্ত যদি পলাণ্ডু রস না দিতেন কারণ আমি পেঁয়াজ খাইনে। যাক্ মহাশয়ের নাম?"

"শ্রীনিত্য প্রাণেশ্বর বিশ্বাস।"

"পিতৃদত্ত নাম?"

"আজ্ঞে না—দিদিমা দিয়েছিলেন 'প্রাণেশ্বর' নাম, আমি বছর খানেক থেকে তাতে 'নিত্য' কথাটা জুড়ে দিইছি।"

"চমৎকার করেছেন! এখন যাই তা হ'লে—"

ভদ্রলোক কাতরস্বরে কহিলেন, "নিতান্তই যাবেন? কি বলব? বেঁধে তো রাখতে পারব না। তবে এই কয়েকটি মুহূর্ত্ত চিরকাল স্মরণ রাখব আমি—"

আমি আর বেশী কিছু না বলিয়াই নমস্কার করিয়া পিছন ফিরিয়া একেবারে ফুটপাথে আসিয়া উঠিলাম, তারপরই ট্রাম।

এখন হইতে প্রাতঃকালে বাজার করিতে হইলে, বৈঠকখানায় গিয়া থাকি।

প্রীতি-উপহার

[বন্ধুবর মজলিস মিঞা সম্প্রতি কাব্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া একটি কবিতা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার রচিত ছাপানো একখানা প্রীতি-উপহার (!) পাঠাইয়াছেন। কাহার বিবাহের প্রীতি-উপহার তাহা পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম না, আমূল অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

শ্রীশ্রীহকনাম।

(প্রিতি—উপহার)

[খাদেম মৌলবী আলী আহাম্মদ মজলিস কর্ত্তৃক কোনও ইয়ারের
বিবাহে বোম্বাই সহরে রচিত]

পয়ারে পহেলা বন্দী আল্লা নিরাকার
দ্বিতীয়ে ছালাম যত ফেরেস্তা তাহার॥
এছরাফিল মেকরাইল আর জেব্রাইল।
সবারে ছালাম দেই আর আজরাইল॥
আল্লার কুদরতে পয়দা সকল জাহান।
আল্লারে ছালাম করি রহিম রহমান॥

(ত্রীপদী)

আল্লা নামে ছুরু করি · বিনয়ে কলম ধরি
দোয়া তার যাচিঞা করিয়া।
প্রিতি—উপহার লেখি মনেতে হইয়া সুখী
ছাহেবান খোসাল হও পড়িয়া*

(পয়ার)

আজি কি রোশনাই হইল বোম্বাই সহরে
সুখের মিলন হইল মোছলেম কাফেরে*
জেয়াফতে কত লোক হাজের হইল।
হালুয়া কালিয়া কোর্ম্মা কত যে খাইল*
খাছীর কাবাব খায় মুর্গীর ছুরুয়া।
কত কত মেওয়া খায় উদর পূরিয়া*
আজি গুলাবের সাথে মালিনীর মিল।
খোদারে ছালাম করি খুলিলাম দিল*
হইল মিলন যেন ইছুফ জোলেখা।
লায়লী মজনু যেমন কিতাবের লিখা*
শিরি আর ফরহাদ য্যায়ছা মিলন।
তেমনি হইল মিল কহিনু বর্ণন*

(ত্রীপদী)

আজি এ চাঁদিনী রাতি আছমানে চাঁদের বাতি
কুকিল গাহিছে মধুর স্বরে।
আশক মাশূক দোনো খোসালে পুরিয়া মনো
হাজির হইল দরবারে॥

(পয়ার)

নাচ বাজা রাগরঙ্গ বহুত হইল।
নাজনিন বাই কত নাচিতে লাগিল॥
বেহালা ছেতার আর তানপুরা এছরাজ।
তবলা ডুগি ঢাক বাজে নাকাড়া পাখওাজ॥
সারিন্দা বাজিল বিণা বোর্ব্বত ছানাই।
সাদিয়ানা বাজা বাজে কত ঠাঁই ঠাঁই॥
দরবার উজালা হৈল তাহাদের ছুরাতে।
মার্‌হাবা মার্‌হাবা কয় সকল জনেতে॥
কাজী মুফ্‌তী মোল্লা আসে চাপকান আঁটিয়া।
হিন্দুপীর দেওধর পাগড়ী সাঁটিয়া॥
ধুমধাম করি সাদি পড়ান হইল।
দস্তুর মাফিক কাম আঞ্জাম হইল॥
এখন দোনোরে কিছু করি নছিহত।
খোদার দোয়ায় দেল থাক খোছালিত॥

একমনে রও দোনো আশক মাশূক।
খোছহালে চিরকাল নাই পাও দুখ॥
দুলহিনের কই কিছু বিশেষ করিয়া।
মমিনী কানুন কই শুন মন দিয়া॥
ফজরে উঠিয়া বিবী অজু করিবেক।
তারপর ফজরের নেমাজ পড়িবেক॥
তারপর বানাইবে খাসা খাসা খানা।
কোফতা পাকাইবে দিয়া খাছীর গর্দ্দানা॥
অর্দ্ধেক পিঁয়াজ দিবে অর্দ্ধেক রসুন।
ঝাল দিবে ঘিউ দিবে আর দিবে লুন॥
এলাইচ জাফরাণ দিবে দারচিনি বাঁটা।
আগুার কুসমী দিয়া করিবে লপেটা॥
তারপর আরবার পড়িবে নেমাজ।
তারপর নাস্তা খাএ করিবেক কাজ॥
পাঁচওক্ত নেমাজ হররোজ পড়া চাই।
তুমি কাফেরের বেটী এত বলি তাই॥
পাঁচওক্ত নেমাজেতে খুছি হয় খোদা।
অধিক পড়িলে পরে ছোয়াব জেয়াদা॥
খছমের পায়ে সদা রাখিবেক মতি।
শবেরাতে মছজেদে দিবে বাপের বাতি॥

বাত্তি দিলে খুলা হয় বেহেস্তের দরওাজা।
মা বাপ বেহেস্তে যায় নাহি পায় সাজাঃ
রোমজান মাসে বিবী রাখিবেক রোজা।
রোজা না রাখিলে বন্ধ বেহেস্তের দরওাজাঃ
হজ আর জাকাতেতে রহিবে মজবুদ।
দেলখোছে পড়িবেক দোয়া আর দরূদঃ
শরিয়ত মত জদি আর তিন জনো।
খছমেতে সাদি করে না হবে পেরসানোঃ
আপন বহিনের মত তিনেরে দেখিবে।
আল্লার রহমৎ এহি মনেতে মানিবেঃ
বেটা বেটী পয়দা হইলে শিখাবে তাবিজ।
শিখাবে মছল্লা জত শরিয়ৎ মাফিকঃ
জতদিন জেন্দা রবে করিবে নেক্ কাম।
প্রিতি-উপহার লিখা হইল তামাম

(তামাম শোধ।)

সম্পাদকের চশমা

দৈনিক মহোৎসব পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীযুক্ত উৎফুল্ল দত্ত মহাশয় গড়গড়ার নল মুখে দিয়া অর্দ্ধস্তিমিত নেত্রে সম্পাদকীয় চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন। দূরে অপর টেবিলের ধারে বসিয়া তাঁহার অন্যতম সহকারী তরুণ কবি অরুণানন্দ বটব্যাল একটা ইংরাজী বিজ্ঞাপন বাংলায় তর্জ্জমা করিতে করিতে জানলার ফাঁকে চাহিয়া সন্তর্পণে ঘনঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে-ছিলেন; দীর্ঘনিঃশ্বাসের হেতু দূরে তেতালার ছাতে শুখাইতে দেওয়া একখানি শান্তিপুরি ডুরে। অপর সহকারী অনুকূল সেনগুপ্ত দাম্পত্য-কলহ-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আসিয়া আফিংএর দাম কমাইবার জন্য জোরালো ভাষায় কাগজে কলমে সরকারকে পরামর্শ দিতেছিলেন। এমন সময় কম্পোজিটার আসিয়া কহিল, "বাবু, প্রুফ্‌টা এক্ষুনি দেখে দিন্।" উৎফুল্ল বাবু চক্ষু মেলিয়া হাই তুলিয়া কহিলেন, "গৌর হে! প্রুফ্? তা' আপনি—"

কম্পোজিটার অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিল, "তা পার্ব্বো না, অনেক ইংরিজী কথা আছে—ভুল চুক্ হবে।"

উৎফুল্ল বাবু গড়গড়ার নল রাখিয়া প্রুফ লইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। এইখানে একটা কথা বলিলে ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হইবে। উৎফুল্ল বাবুর বয়স সম্বন্ধে তাঁহার সহকারিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। থাকিবারই কথা, যেহেতু তাঁহার চেহারা দেখিয়া বয়স বুঝিবার উপায় ছিল না। চুল দু' একগাছি পাকিয়াছিল বটে, কিন্তু গালে টোল খায় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী 'বায়স' ও 'রক্তপাণি' পত্রিকার সম্পাদকেরা বলিতেন যে উৎফুল্ল দত্ত আপিসে আসিবার সময় গালে মার্ব্বেল পুরিয়া আসেন; দত্তজাকে তাঁহারা স্বচক্ষে মার্ব্বেল কিনিতে দেখিয়াছেন। জানিনা।—তবে দত্তজাকে প্রশ্ন করিলে তিনি নায়কসুলভ হাস্য করিতেন। তিনি কিছুদিন হইতে চোখে কম দেখিতেছিলেন কিন্তু সেটা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। গোপনে ছয় পয়সা দামের একজোড়া চশমা পরিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আরসীতে দেখিলেন যে চশমা পরিলে বয়সটা বছর দশেক বেশী বলিয়া মনে হয়। সেই অবধি চশমা পরিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন কিন্তু আপিসের কাজে কিছু গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। আপিস শুদ্ধ সকলে চশমা লইতে পরামর্শ দিলে উৎফুল্ল বাবু হাসিয়া কহিলেন, "গৌর হে! চশমা! এই বয়সে!"

ইহার পর আর বন্ধু বান্ধবেরা উৎফুল্ল দত্তের দৃষ্টিশক্তি লইয়া প্রকাশ্যে আলোচনা করিতেন না, কিন্তু কম্পোজিটারদের সহসা

নির্ভুল কাগজ ছাপা সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহ জন্মিয়া গেল, তাহারা ক্রমাগত বাজার দর হইতে আরম্ভ করিয়া মূল সম্পাদকীয় পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ের প্রুফ্ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিল। উৎফুল্ল বাবু একটু বিব্রত হইলেন কিন্তু নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া বিরক্ত হইতে পারিতেন না, মনে মনে কহিতেন, "অদ্বৈত সীতানাথ বিপদ হ'তে উদ্ধার কর প্রভু!"

এই প্রুফ্ দেখা সমস্যা কালে আমাদের কথারম্ভ হইয়াছে।

উৎফুল্ল বাবু ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করিয়া প্রায় নাকের মাঝামাঝি আনিয়া কহিলেন, "রাধে গোবিন্দ! কি ছেপেছ ছাই! কিছু বোঝবার কি যো আছে? অনুকূল বাবু একটু আসুন তো।"

অনুকূল বাবু টেবিল হইতে না উঠিয়াই কহিলেন, "একটা চশমা নিন্ উৎফুল্ল বাবু, নৈলে কাগজ চল্‌বে না বলে দিচ্ছি। সাম্‌নে সরকারী বাজেট, খুঁটিনাটি অঙ্ক কস্‌তে হবে, এখন কি আর——"

উৎফুল্ল বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তা' যাই বলুন আপনারা, চশমা আমি নিচ্ছি নে। এই বয়সে চশমা! গৌর হে! দয়াল গৌর! আপনি এদিকে আসুন তো বঙ্কুবাবু।"

নিউস-এডিটার বঙ্কুবাবু একটা টুলের উপর হাঁটু তুলিয়া কি যেন লিখিতেছিলেন, উৎফুল্ল বাবুর ডাকে সাড়া দিলেন না।

দ্বিতীয় বার ডাকিতেই তিনি কহিলেন, "আমি জরুরী কাজে আছি মশাই, এখন পার্‌ব না।"

"জরুরী কাজ মানে?" উৎফুল্ল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ডাকে চিঠি দিতে হবে মশাই, পরিবারকে চিঠি লিখ্‌ছি।" বঙ্কুবাবু মুখ না তুলিয়াই কহিলেন।

"সেটা না হয় কালই লিখ্‌বেন—এটা একটু——"

"কাল কি মশাই? কালকের ডাকে চিঠি না পেলে সে সরলা বালা কি প্রাণে বাঁচ্‌বে? আহা——"

উৎফুল্ল বাবু ব্যথিত হইয়া তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া কহিলেন, "আহা লিখুন লিখুন! চিঠিটা লিখে এদিকে একবার—"

বঙ্কুবাবু গলিয়া গেলেন এবং উৎফুল্ল বাবুকে প্রুফ্‌ দেখার দায় হইতে সেদিন অব্যাহতি দিলেন।

(২)

সেদিন পথে চলিতে চলিতে গুটি তিনেক চশমার দোকানের সামনে উৎফুল্ল বাবু থামিলেন, কিন্তু ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। বাড়িতে যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন রাত্রি দশটা। উৎফুল্ল বাবুর পত্নী পল্লবিনী দেবী কোমরে গামছা জড়াইয়া রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কলতলায় একটি রোহিত মৎস্য

ও আঁশবটি লইয়া বসিয়া ছিলেন, উৎফুল্ল বাবু তখন আর চশমা কিনিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না; কারণ গৃহিণীর 'আড়াই প্যাঁচ' তৈয়ারীর সেই পুরাতন প্রসঙ্গটি চশমা কিনিবার প্রসঙ্গে উঠিয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। খাইতে বসিয়া উৎফুল্ল বাবু প্রাণপণ বলে চশমা কিনিবার পরামর্শ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পল্লবিনী কহিলেন, "চশমা কিনেই বা হবে কি? আমার হাল তো আর চোখে পড়্‌বেনা।"

উৎফুল্ল বাবু নিভিয়া গেলেন। মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া গীতগোবিন্দের সরস গুটিকয়েক পদ মনে মনে আবৃত্তি করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম—আমিও তোমার, চশমাও তোমার।"

পল্লবিনী দেবী আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিলেন, "আগে তাই ভাব্‌তাম এখন আর— আচ্ছা পরে বল্‌ব।" বলিয়া চচ্চড়ি আনিতে বরাবর রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

উৎফুল্ল বাবু থতমত খাইয়া গেলেন। হঠাৎ গৃহিণীর কথায় তাঁহার কি রকম ভয় হইল, তাঁহার কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। জীবনের নারী সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা মনে মনে একবার কল্পনা করিয়া গেলেন। কোথাও তো সংশয়ের কারণ ঘটিতে পারে না! এম্পায়ার থিয়েটারে এ্যানা প্যাভলোভার উলঙ্গ নৃত্য দেখিয়া তিনি বাহবা দিয়াছিলেন, তাঁহার

কোনও শত্রু কি সে কথা গৃহিণীকে জানাইয়া গিয়াছে। ভাবিয়া কিছু ঠাওর করিতে পারিলেন না ; তাঁহার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। নানারূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতঃকালেই আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথিবীর নারীজাতির উপর অকস্মাৎ তাঁহার বিরাগ উপস্থিত হইল। আপিসে আসিয়াই নোটিশবোর্ডে নিজ স্বাক্ষরিত এক নোটিশ লটকাইয়া দিলেন,—

"এতদ্দ্বারা সব্ এডিটারগণ, কম্পোজিটারগণ এবং আপিসের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ মায় দপ্তরীসাহেবগণ সকলকে জানান যাইতেছে যে, অত্র আপিসে বসিয়া কেহ তাঁহার স্ত্রী অথবা বিবিকে পত্র লিখিতে পারিবেন না, অথবা অত্র ঠিকানায় তাঁহাদিগের কোনও চিঠিপত্র আসিতে পারিবে না, আসিলে তাহা সম্পাদকীয় দপ্তরে বাজেয়াপ্ত হইবে।"

কর্ম্মচারিগণ প্রমাদ গণিলেন। বঙ্কুবাবু আসিয়া শুষ্কমুখে কহিলেন, "আজ্ঞে, আমাকে তো তা হ'লে চাকুরী ছাড়্‌তে হয়।"

উৎফুল্ল বাবু কহিলেন, "স্ত্রী তো সকলেরই আছে মশাই—"

"কিন্তু আমার স্ত্রীর মত সকলে নয় মশাই। সে অবলা বালা..."

আজ বঙ্কুবাবুর অবলা স্ত্রীভাগ্যের জন্য তাঁহার উপর উৎফুল্ল বাবুর হিংসা হইল, কহিলেন, "জান্‌বেন এটা আপিস। যা

বল্‌লাম তার যেন নড়চড় না হয়। আমার চশমা নেই কিন্তু সব দেখ্‌তে পাব। যান কাজে যান।”

বঙ্কুবাবু টুলের উপর গিয়া বসিয়া বিরহী যক্ষের মত ব্যারাকপুরগামী এরোপ্লেন খানার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল কর্ম্মচারীই নোটিশ দেখিয়া আপন আপন ঘরে গিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আপিসের বয় সখীয়া লেখাপড়া জানিত না, সকলের মুহ্যমান অবস্থা দেখিয়া উৎফুল্ল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কেয়া হুয়া বাবু? কোই নয়া লীডর মর্ গিয়া! স্পেশ্যাল নিকালে গা?”

উৎফুল্ল বাবু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, “সব লেডী লীডর মর্ গিয়া, সব বাবুকা জরু মর্ গিয়া, উৎফুল্ল বাবু ভি গিয়া——”

বয় সেলাম করিয়া পিছন ফিরিয়া খৈনির ডেলাটি গালে ফেলিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে কহিল, “বড়ি আফ্‌শোস কা বাত!”

বেলা দশটা বাজিতেই সম্পাদক মহাশয় কহিলেন, “আমি আজ থেকে এখানেই খাব মণীশ বাবু। দুপুর বেলা খান আষ্টেক রাধাবল্লভী, বৈকেলে চারটে ডিম, রাত্রে ভাত—দাদখানি। ব্যবস্থা কর্‌বেন আর সব চিঠিপত্র যারই হৌক্ আমার টেবিলে—বুঝলেন। দস্তুর মত আপিস হবে। প্রুফ্ সব আমি দেখ্‌ব। আমার বাড়ী থেকে ডাকতে আস্‌লে বলবেন,—সাম্‌নে বাজেট, বাড়ী যাবার সময় নেই।”

সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! যে উৎফুল্ল বাবু অবসর পাইলেই আপিসের তেতালা হইতে শ্যামবাজারগামী ট্রামের দিকে চাহিয়া থাকেন আজ তাঁহার এ কি পরিবর্ত্তন! কবি অরুণানন্দ কহিলেন, "কী নিদারুণ সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তব্য বোধ, রূপসী ষোড়শীর অপাঙ্গ ভঙ্গীর মতো—"

উৎফুল্ল বাবু কথাটি শুনিয়া কহিলেন, "দেখুন অরুণানন্দ বাবু, স্ত্রী সম্বন্ধীয় উপমা আমার সম্পর্কে দেবেন না, সেটা আমার রুচি বিগর্হিত, বুঝ্‌লেন? গৌর হে! গৌর!"

(৩)

নারী প্রসঙ্গ বর্জ্জিত শুষ্ক পলিটিক্‌স চর্চ্চা করিয়া সব্‌এডিটারগণ হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিলেন, কিন্তু উৎফুল্ল বাবুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। দুই দিন কাটিয়া গেল, বাড়ী হইতে কেহও ডাকিতে আসিল না। উৎফুল্ল বাবু আরও কঠোর হইলেন। ডাকের সময় হইলেই অনুকূল বাবু একতলায় জল খাইবার অছিলায় গিয়া পিওনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন, উৎফুল্ল বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কড়া হুকুম জারী করিলেন— তাঁহার নির্দ্ধারিত সময় ছাড়া কেহ নীচে যাইতে পারিবে না! দুর্ব্বল চোখে রাশিকৃত চিঠি পড়া ও প্রুফ্‌ দেখিতে দেখিতে

তাঁহার চোখ লাল হইয়া গেল। ম্যানেজার মণীশ বাবু আসিয়া কহিলেন, "এক জোড়া চশমা নিন্ মশাই, আর এ রকম ক'রে——"

উৎফুল্ল বাবু দুইহাত ঘুষির আকারে শ্যামবাজারের দিকে প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "হই অন্ধ হব। স্বার্থপর নারী জাতিকে দেখাব কি স্বার্থত্যাগ পুরুষে——" বলিয়াই তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিলেন। মণীশ বাবু মূল ব্যাপারটির কারণের সন্ধান পাইয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন সহকারীরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তরুণায়তনের সদস্যাদের দোদুল নৃত্য দেখিতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সম্পাদকীয় টেবিলের উপর পুঞ্জীকৃত খোলা চিঠি, তাহার সম্মুখে দুইহাতে চক্ষু আবৃত করিয়া উৎফুল্ল বাবু একাকী বসিয়া ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য ইতিমধ্যে বার তিনেক তাগিদ আসিয়া গিয়াছে ; বাজেট আলোচনার প্রথম অংশ সমাপ্ত করিয়া উৎফুল্ল বাবু মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া একটা ঝাঁঝালো রকম উপসংহার আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় কম্পোজিটার আবার তাগিদ দিয়া গেল। উৎফুল্ল বাবু লিখিতে বসিলেন। লেখা শেষ হইলে দেখিলেন যে চোখ ও মাথা দুই অঙ্গই টন্ টন্ করিতেছে। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র ঘাঁটিয়া উপসংহারের পাতাগুলি গুছাইয়া কম্পোজিং রুমে পাঠাইয়া

ঈজি চেয়ারে শুইয়া পড়িলেন। কম্পোজিটারের উপর প্রুফ্ দেখিবার আদেশ থাকিল।

*   *   *   *

শেষ রাত্রে সহসা বিস্তর লোকের কলরবে উৎফুল্ল বাবুর চেতনা হইল। চাহিয়া দেখিলেন তিনি মেঝেতে মাতুর শয্যায় লম্বমান, মাথা টন্ টন্ করিতেছে, মাথার কাছে শ্রীযুক্তা পল্লবিনী দেবী বসিয়া বাতাস করিতেছেন। ঘরের চারিপাশে বারান্দায় কর্মচারীরা সশঙ্ক পদক্ষেপে যাতায়াত করিতেছে। উৎফুল্ল বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বিহ্বল দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। পল্লবিনী দেবী শুধু কহিলেন, "চশমার অর্ডার দিয়ে এসেছি।"

উৎফুল্ল বাবু রণজয়ী বীরের মত মৃদু হাস্য করিয়া চক্ষু মুদিলেন কিন্তু এতকথা থাকিতে গৃহিণী সহসা চশমার কথাটাই প্রথমে কেন উত্থাপন করিলেন সহসা তিনি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন সময় সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে "কোথায় প্রাণেশ্বর?" বলিয়া চারের ফর্ম্মার একখানি 'মহোৎসব' হাতে করিয়া প্রুফ্ ডিরেক্টার রাখাল বাবু প্রবেশ করিলেন। পল্লবিনী দেবী পর্দ্দা তুলিয়া পাশের ঘরে ঢুকিলেন। উৎফুল্ল বাবু কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অনুকূল বাবু চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া হাতের কাগজখানি

মুঠা করিয়া উৎফুল্ল বাবুর বিছানায় ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "এ কি করেছেন উৎফুল্ল বাবু? আমার স্ত্রীর প্রাইভেট্ লেটার, তাই লীডারে ছেপে দিয়েছেন? আমার লাজুক স্ত্রী! আহা!"

উৎফুল্ল বাবু ছিন্ন-জ্যা ধনুকের মত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এঁ্যা! আপনার স্ত্রীর চিঠি ছাপ্‌ব আমি? গৌর হে!" কিন্তু তখনি গোলমাল পরিষ্কার হইয়া গেল। রাখালবাবু তারস্বরে সুর করিয়া লীডার পড়িতে লাগিলেন, লেখা আছে—"বাজেট সম্পর্কিত আলোচনা করিতে গিয়াই প্রথমে এই কথা মনে পড়ে যে, দেশের লোকের ক্ষুন্নিবারণের কোনও উপায়ই সবকার করিতেছেন না—কেবল সামরিক ও পুলিশ সম্বন্ধীয় ব্যাপাবেই প্রজার টাকা ক্ষয় হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কি ভুলিয়াছেন যে এই ভারতবর্ষের শতকরা নব্বই জন লোক নিরক্ষর, পঁচানব্বই জন লোক নিরন্ন! আমরা গবর্ণমেণ্টকে বলি—" এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই রাখাল বাবু সুর নামাইয়া আবার পড়িতে লাগিলেন, "—বলি প্রাণেশ্বর, তোমার পদাশ্রিতা দাসী নীহারের কথা কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ? ভুলিয়া গিয়াছ কি যে সামনের আশ্বিন মাসেই আমার সেই পার্শী শাড়ীখানার মত আর একখানা পার্শীশাড়ী কিনিবার কথা ছিল? ইত্যাদি—" অনুকূল বাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"আমার প্রাইভেট্ ব্যাপারের সঙ্গে বাজেটের—"

উৎফুল্ল বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "—বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে অনুকূল বাবু! আপনাদের সকলের চিঠিই ছিল আমার টেবিলে, কোন ফাঁকে লীডারের স্লিপের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে!"

গোলমাল তখনই পরিষ্কার হইয়া গেল। রাখাল বাবু অনুকূল বাবুকে লইয়া মেসিন রুমে চলিয়া গেলেন। পল্লবিনী দেবী আসিয়া কহিলেন,—"ওই চিঠিটা তোমার পকেটেও আমি দেখেছিলাম, তাইতেই মনটা ভার হ'য়ে ছিল। যা হোক্ ভালই হ'ল।"

উৎফুল্ল বাবু হাসিয়া কহিলেন, "All's well that—চশমা আজই নেব।"

* * * *

পরদিন সন্ধ্যাকালে ট্যাক্সি চাপিয়া উৎফুল্ল বাবু আপিসে আসিলেন; তাঁহার চোখে সোনার পাঁস্‌নে চশমা। আসিয়াই নোটিশবোর্ডে লটকাইয়া দিলেন—

"এতদ্দ্বারা সব্‌এডিটারগণ, কম্পোজিটারগণ এবং আপিসের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ মায় দপ্তরীসাহেবগণকে জানান যাইতেছে যে, প্রতি ডাকের সময় যেন তাঁহারা সতর্ক থাকেন এবং প্রত্যেকের স্ত্রী এবং বিবির চিঠিপত্র যেন স্বহস্তে ডেলিভারী লন, নচেৎ ভুলক্রমে সম্পাদকের টেবিলে চিঠিপত্র গিয়া পৌঁছিলে নানা প্রকার গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে এবং তাহার জন্য সম্পাদক দায়ী হইবেন না।"